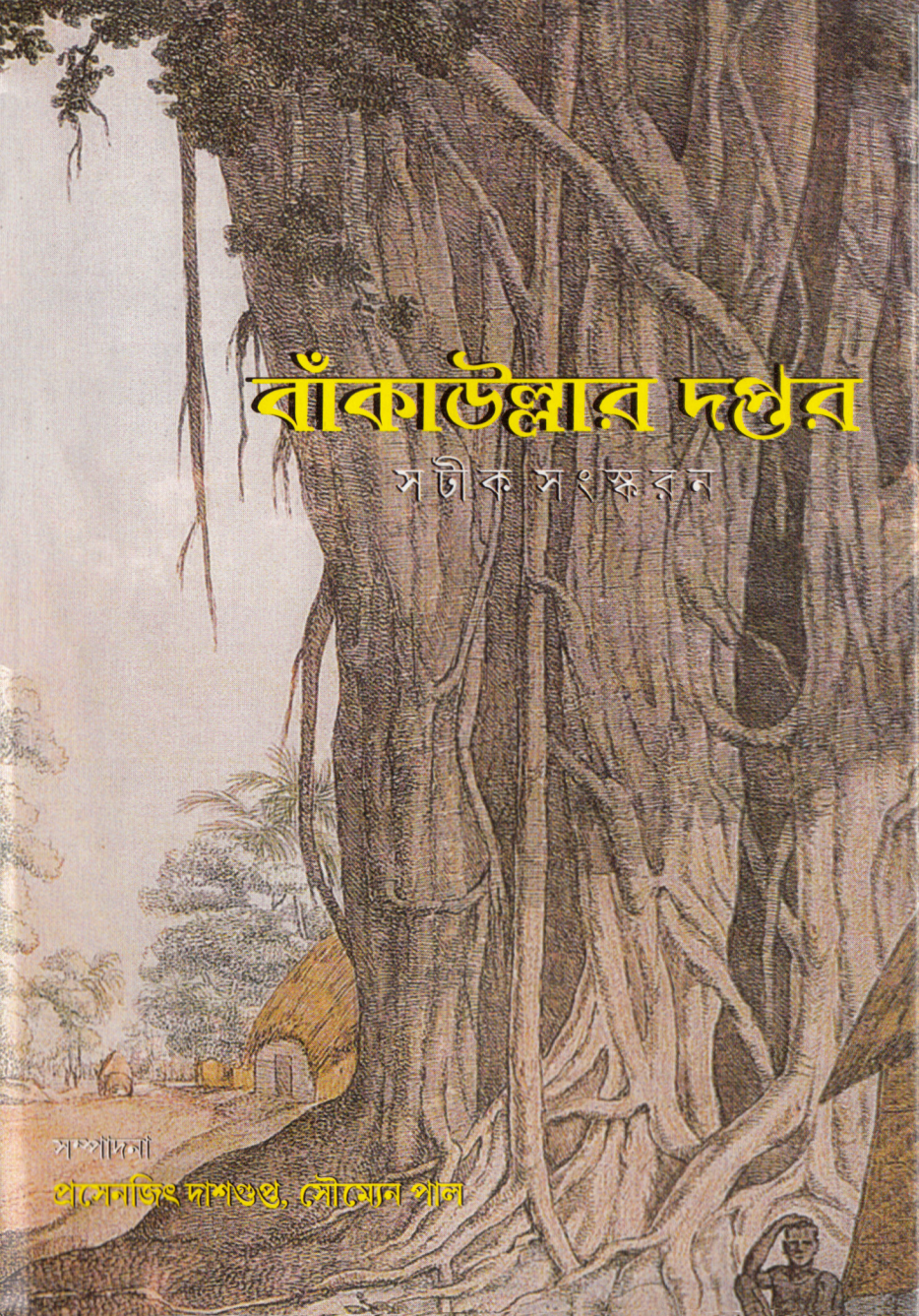

বাঁকাউল্লার দপ্তর

সটীক সংস্করণ

সম্পাদনা
প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সৌম্যেন পাল

সটীক সংস্করন

বাঁকাউল্লার দপ্তর

সম্পাদনা

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সৌম্যেন পাল

চর্চাপদ

বাঁকাউল্লার দপ্তর

সম্পাদনা
সৌম্যেন পাল প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

চর্চাপদ
১৩বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০১২

Bankaullar Daptar
Detective Story

Published by Biswadip Ghosh
Charchapada Publication Pvt. Ltd.
13B, Radhanath Mullick Lane, Kolkata-700 012
email:charchapada@gmail.com
₹180.00

টীকা© প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সৌম্যেন পাল

চর্চাপদ সংস্করণ
জানুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
বিশ্বদীপ ঘোষ
চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
১৩বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২
ফোন: ২২৫৭ ৩১৪৪

অক্ষর বিন্যাস
বিশ্বজিৎ বসু

মুদ্রক
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪৩ ওল্ড যশোহর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা-৭০০ ১৩২

প্রচ্ছদ
সৌম্যেন পাল
ISBN 978-93-80489-24-7
১৮০ টাকা

পুরোনো বইয়ের গোয়েন্দা
ইন্দ্রনাথ মজুমদারকে

সূচি

কিসসা বাঁকাউল্লা-কা ৯
পূর্বাভাষ—আত্মকথা ১৯
হাতকাটা হরিশ ২৬
নবীন নবেসেন্ধা ৪৮
রায় মহাশয় ৬৫
দেওয়ানজি ৭৪
হারানী ৮৬
কেঁচো খুঁড়িতে সাপ! ৯৮
হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস ১১০
বহুরূপী ১২৪
গহনাভোজী কুমীর ১৩৮
উমোকান্ত ১৪৫
নিস্তার ১৬১
মামুদ হাতি ১৭০

কিসসা বাঁকাউল্লা-কা

যতদূর সন্ধান পাওয়া যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ক্রাইম কাহিনি হল পুলিশের দারোগা বাঁকাউল্লার কীর্তিকলাপ। *বাঁকাউল্লার দপ্তর* নাম দিয়ে প্রকাশিত দারোগা সাহেবের বারোটি কীর্তির প্রথম প্রকাশ যে কবে, সে সম্বন্ধে জানা যায় না। তবে *বাঁকাউল্লার দপ্তরে* বর্ণিত ঘটনার সময়কাল যতদূর সম্ভব উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের একেবারে শেষ দিকে কিংবা চল্লিশের দশকে। কারণ ঠগী দমনের জন্য নির্দিষ্ট আলাদা বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট স্লীম্যান সাহেব কমিশনার পদে উন্নীত হয়েছিলেন ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে।

ইংরেজ অধিকৃত ভারতে উনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকেই পুলিশ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অধ্যাপক সুকুমার সেন-এর মতে যথার্থ ডিটেকটিভ কাহিনি পুলিশ-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পরই রচিত হয়। ফ্রান্সে ওই শতকের প্রথম দশকে পুলিশ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল এবং ফরাসি সাহিত্যে তথা বিশ্ব-সাহিত্যে পুলিশের তদন্তের প্রাচীনতম কাহিনি সম্ভবত *মেমোয়ার্স দ্য ভিদক : শেফ দে লা পোলিস দে সুরেতে, যসকন* ১৮২৭, যার প্রকাশ ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে। ইউজিন ফ্রাঁসোয়া ভিদক (১৭৭৫-১৮৫৭) বাস্তব চরিত্র। আরাস শহরের সম্ভ্রান্ত রুটি-প্রস্তুতকারক (Baker) নিকোলাস যোসেফ ফ্রাঁসোয়া ভিদকের সাত সন্তানের তৃতীয় ইউজিন ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। চোদ্দো বছর বয়সে বাবার ক্যাশবাক্স ভেঙে টাকা চুরি করে পলাতক ইউজিন বুরবোঁ রেজিমেন্ট নামক সৈন্যবাহিনীর সদস্য হন আরও দু-বছর পর। জানা যায়, ছয় মাসের মধ্যে

পনেরো জনের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে দ্বৈরথ বা ডুয়েল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে কমপক্ষে দু-জন মানুষকে হত্যা করেন নিপুণ অসিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাত ইউজিন। ১৭৯২-এ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে রণাঙ্গনে প্রেরিত হন ভিদক। যুদ্ধের পর প্যারিসে থাকাকালীন বেশ কয়েকবার বিভিন্ন অপরাধে জেল খাটতে হয় তাঁকে। কয়েকবার জেল থেকে পালাতেও সফল হন তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশের চর হিসেবে কাজ করতে সম্মত হওয়ার বিনিময়ে মুক্তি পান। ১৮১১-এ ভিদক সাদা পোশাকের পুলিশ-বাহিনী গঠন করেন ব্রিগেদে দে লা সুরেতে বা সিকিউরিটি ব্রিগেড নামে। ১৮১২ সালে এই বাহিনী প্যারিসের প্রিফেকচার অব পুলিশের একটি বিভাগ হিসেবে স্বীকৃত হয়। ভিদক এই বিভাগের কর্তা নিযুক্ত হন। ১৮১৩ সালের সতেরোই ডিসেম্বর ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এই বিভাগকে সুরেতে নাশিওনেল ঘোষণা করেন। ১৮২৭ সালে ভিদক এই চাকরি থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৯২৮ মেমোয়ার্স দ্য ভিদকের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের আরও তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে। পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার পর ভিদক লে ব্যুরো দ্য রেনসেঁমেন্তস (অফিস অব ইনফরমেশন) নামক প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছিলেন। কিন্তু এই বিখ্যাত এবং লাভজনক সংস্থা ভিদক ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ করে দিয়ে আলফোঁসে লা মার্টিনের সঙ্গে ফরাসি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হন।

অনুমান করা যায়, ভিদকের অভিজ্ঞতার কাহিনিগুলি ভিদকের নিজের লেখা নয়, তাঁর কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে এ গুলি অনুলিখন করেছিলেন একাধিক লেখক। তাঁদের মধ্যে আলেকজান্দার দুমা, ভিক্তর হুগো, অনরে দে বালজাক, ইউজিন সু প্রমুখের মতো

লেখকরাও থাকতে পারেন বলে মনে করা হয়। কারণ, সেই সময়ের এই উঠতি সাহিত্যিকরা ছিলেন ভিদকের কীর্তিকলাপের বিশেষ অনুরাগী।

বাংলায় লেখা ক্রাইম সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, সুকুমার সেনের *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি*-তে অধ্যাপক সেন লিখেছেন, 'ভিদক তাঁর গ্রন্থাবলীর রচয়িতা হোন বা না হোন, কাহিনীগুলির যে নির্মাতা তাতে সন্দেহ করা চলে না। মহাভারত যেমন গণেশ কালিকলম দিয়ে তালপাতায় লিখেছিলেন আর বেদব্যাস তা রচনা করে মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন, তেমনি *মেমোয়ার্স দ্য ভিদক* ইত্যাদির লেখক যেই হন, স্রষ্টার গৌরব ভিদকের প্রাপ্য।'

খাঁটি বাঙালি দারোগা বাঁকাউল্লা তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিয়েছেন *বাঁকাউল্লার দপ্তর* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে। তা ছাড়া অধ্যাপক সেন বাঁকাউল্লা সম্পর্কে কিছু তথ্য আহরণ করেন ১২৪৪ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত মহম্মদ মিরণ রচিত *বাহারদানেস* গ্রন্থ থেকে। এ ছাড়াও, বাঁকাউল্লার কাহিনিগুলি পড়ার সময়ে দারোগা সাহেবের বিবরণে কখনও ফুটে ওঠে তাঁর নিজের বিষয়ে দু-এক কথা। সেই তথ্যগুলি একত্র করে বলা যেতে পারে, বাঁকাউল্লার আসল নাম বরকতউল্লা খাঁ। স্বচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম, গ্রামের বাড়িতে থাকাকালীন কিছু পড়াশোনা সেরে এসে শহর কলকাতায় বা কোনও জেলা সদরের মাদ্রাসায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দারোগার চাকরিতে যোগদান।

বাঁকাউল্লার চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময়কাল সম্পর্কে আন্দাজ করার আরও একটি সূত্র পাওয়া যায় গ্রন্থের একেবারে প্রথম পংক্তিতে। বরকতউল্লা লিখেছিলেন, 'লর্ড হেস্টিংস হইতে হার্ডিঞ্জ,

—ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী ভার গ্রহণ হইতে, বাঙ্গালা দেশে শান্তি-সংস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন...।' লর্ড হার্ডিঞ্জের ভারতে গভর্নর জেনারেল থাকার মেয়াদ ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮। অনুমান করা যায় বাঁকাউল্লা প্রায় ওই সময়েই চাকরিতে আসেন। তা না হলে, তিনি হেস্টিংস থেকে শুরু করে হার্ডিঞ্জে এসে থামতেন না। কারণ ঠগী-দমন সম্পূর্ণ হতে হতে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ প্রায় পার হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী বছর, ১৮৭১-এ ক্রিমিনাল ট্রাইব্স অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়। ততদিনে লর্ড ক্যানিং, লর্ড এলগিন, আর্ল অব মেয়ো প্রমুখ তাবড় তাবড় গভর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় এসেছেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে।

অবশ্য বরকতউল্লা খাঁ যে তার কীর্তিকাহিনি ওই চল্লিশের দশকেই রচনা করেছেন, তা-ও নয়। কারণ তিনি নিজেই লিখছেন, 'আমার নিজের জীবনে যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে...তাহা অতি অদ্ভুত, অবসরকালে সে সকল বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি পথ খরচ করিয়া আমার দরিদ্র-কুটীরে পদার্পণ করেন।' অনুমান করা অসুবিধা নয় যে দারোগা-সাহেব তাঁর অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর। ঠিক যেমন করেছিলেন কয়েক দশক আগে ইউজিন ফ্রাঁসোয়া ভিদক।

বাঁকাউল্লার দপ্তর-এর রচনাকাল প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন যে, ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের আগে বইটি ছাপা হয়েছিল। তবে তার কত আগে, সে সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হওয়া যায়নি প্রমাণাভাবে। অধ্যাপক সেন, আরও জানিয়েছেন, বরকতউল্লার সফল তদন্তের কিছু কাহিনি পুলিশের ফাইল থেকে উদ্ধার করে ইংরেজি ভাষায় ছাপা হয়েছিল আনুমানিক ১৮৫৫ সালের পর। তার বেশ

কিছুকাল পরে এটি বাংলায় রূপান্তরিত ও মুদ্রিত হয় *বাঁকাউল্লার দপ্তর* নামে। অধ্যাপক সেন যেহেতু এই গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল সম্পর্কে স্থির-নিশ্চিত হতে পারেননি, তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন *বাঁকাউল্লার দপ্তর* যদি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের *দারোগার দপ্তর*-এর আগে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এই বইয়ের নামের অনুসরণে প্রিয়নাথবাবু তাঁর বইয়ের নামকরণ করেছিলেন। আর যদি *দারোগার দপ্তর* আগে প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সেই বইয়ের নামে প্রভাবিত হয়ে *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর নামকরণ করা হয়েছিল।

বরকতউল্লার কাহিনি বরকতউল্লা নিজে লিখেছিলেন, নাকি অন্য কেউ লিখেছিলেন, তা আর জানা যায় না। অধ্যাপক সেনের আন্দাজ, স্বয়ং প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-ও লিখে থাকতে পারেন *বাঁকাউল্লার দপ্তর*। যিনিই লিখে থাকুন, তাঁর যে তৎকালীন আইন, আইনি-ভাষা এবং পুলিশের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল, তা গ্রন্থপাঠে সহজেই বোঝা যায়।

শ্রী অশোক উপাধ্যায় *এক্ষণ* পত্রিকায় সন ১৩৯৪-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'কালীপ্রসন্ন ও বাঁকাউল্লা' শীর্ষক নিবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, *বাঁকাউল্লার দপ্তর* আসলে বটতলা-যুগের সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। শ্রী উপাধ্যায় শুধু অভিমতই ব্যক্ত করেননি, তাঁর মতের স্বপক্ষে তিনি যথেষ্ট প্রমাণও উপস্থাপিত করেন ওই নিবন্ধে। শ্রী উপাধ্যায়ের নিবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

"বাঁকাউল্লার দপ্তর যে কালীপ্রসন্নর রচনা তার প্রমাণ আছে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে (Bengal Library Catalogue quarter ending September 1896, pp. 10-11, sl. no. 4030)।

বইটির প্রকাশক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণের প্রকাশ তারিখ ১৪ জুলাই ১৮৯৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪০, মূল্য আট আনা, লেখকই স্বত্বাধিকারী, লেখক ও প্রকাশকের ঠিকানা একই—১৭ ঈশ্বর মিল লেন।

মন্তব্য ('Remarks') স্তম্ভে লেখা হয়েছে: 'A collection of very interesting detective stories, twelve in number, narrating incidents of real life, which happened in the days of Thugge Commission. The incidents related were investigated by an able officer of the police of the day, named Banka-ulla, and hence the name of the book. The book may be read with profit by the detective officers of the present day.'

কালীপ্রসন্নর সপক্ষে আরো একটি প্রমাণ আছে: সুবলচন্দ্র মিত্র, দশ বৎসরের বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্য-সংহিতা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১২, পৃ ১৬৫-১৭৩। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নিম্নরূপ: 'শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কৃত "বাঁকাউল্লার দপ্তর" খানিও নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাতে ১২টী ডিটেক্‌টিভের গল্প একত্রে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত এদেশের "ঠগ" নামক দস্যু-সম্প্রদায়ের দমনার্থ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে যে ঠগী কমিশন বসে, তাঁহাদের রিপোর্ট হইতে দ্বাদশটী ঘটনার সঙ্কলন করিয়া কালীপ্রসন্নবাবু আপনার স্বাভাবিক মোহিনী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। গল্পগুলি সবিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। বাঁকাউল্লা নামক তদানীন্তন একজন সুদক্ষ দারোগা এই সকল ঘটনার "আস্কারা" করেন। এইজন্যই এই পুস্তকের নাম "বাঁকাউল্লার দপ্তর" রাখা হইয়াছে। গল্পগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না।' (পৃ ১৭৩)।"

শ্রী উপাধ্যায় বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে আরও অনুমান করেন, দর্জিপাড়ার বসাক অ্যান্ড সন্‌স প্রকাশিত *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর যে সংস্করণের পাঠ অবলম্বনে অধ্যাপক সুকুমার সেন সম্পাদিত *বাঁকাউল্লার দপ্তর* (এ. কে. পাবলিশার্স, ১৩৮৯) মুদ্রিত হয়েছিল, সেই সংস্করণটি পাইরেটেড হওয়ায় লেখকের নাম তাতে পাওয়া যায়নি।

অপর এক গবেষক, অধ্যাপক মৃণালকুমার বসু, তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানের এবং বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, বাঁকাউল্লা এবং বরকতউল্লা কখনই এক ব্যক্তি নন। বিভিন্ন সরকারি নথি এবং সংবাদপত্র অনুসন্ধান করে অধ্যাপক বসু মুনশী বাঁকাউল্লা নামক এক একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশের সন্ধান পেয়েছিলেন। মুনশী বাঁকাউল্লা পদোন্নতির আগে দারোগার পদে বহাল হয়েছিলেন এবং ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী জেলার পুলিশের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুনশী বাঁকাউল্লার চাকরি-জীবন সম্পর্কিত বহু তথ্য অধ্যাপক বসু উপস্থাপন করেছেন তাঁর গ্রন্থে *দারোগার দরবার*-এর (অক্টোবর ২০০৮) 'সত্যি গোয়েন্দার সন্ধানে: মুন্সী বাঁকাউল্লা: অপরাধ অনুসন্ধান পদ্ধতি ও এক দেশী গোয়েন্দা' শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃ: ১০০-১৪৩)। শুধু মুন্সী বাঁকাউল্লার চাকরি জীবনই নয়, ওই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে সেকালের পুলিশী-তদন্তের বহু রিপোর্টের কথা, যাতে *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এ বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে কিছু না কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক বসুর মতে, *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর আসল লেখক, তথা নায়ক, মুনশী বাঁকাউল্লা, এবং কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় হতে পারেন সম্ভাব্য অনুলেখক বা লিপিকার। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা অন্য বইগুলির ভাষা এবং চরিত্র *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর তুলনায় একেবারে আলাদা।

বাঁকাউল্লা-বরকতউল্লা-মুনশী বাঁকাউল্লা বা কালীপ্রসন্ন-প্রিয়নাথ বিতর্কের আশু সমাধানের কোনও সম্ভাবনা এই মুহূর্তে দেখা যায় না। কিন্তু, সার্ধশতবর্ষেরও বেশি সময় পরে, আজকের দিনে লেখক বিতর্ক নতুন করে উজ্জীবিত না করে বরং *বাঁকাউল্লার দপ্তর*-এর

কাহিনিগুলির রস আস্বাদন করা অবশ্যই অনেক বেশি উপভোগ্য কাজ মনে করা যেতে পারে।

উত্তম-পুরুষে বর্ণিত কাহিনির গোয়েন্দা বাঁকাউল্লা শিক্ষিত বাঙালি যুবাপুরুষ। গ্রাম এবং শহর, দুই অঞ্চলেরই জীবনযাত্রা বা আদব-কায়দা, সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সহজেই সমাজের যে-কোনও স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন তিনি। নিজে মুসলমান হলেও অন্য ধর্মের বা অন্য জাতের মানুষের প্রতি তার কোনও বীতরাগ বা অশ্রদ্ধা কখনও প্রকাশ পায়নি। বরং দেখা গিয়েছে, বরকতউল্লার জগতে জাতিগত বিতৃষ্ণা বা অমিল-একেবারেই অনুপস্থিত। কাহিনির অনেক ছোটোখাটো ঘটনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, 'বহুরূপী' কাহিনিতে গোপাল ও তার পরিবারের বিপদে দারোগা সাহেবের বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনার কথা।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে আব্দুস শুকুর তাঁর *বাংলার পুলিশ-সেকাল একাল* (নবদ্বীপ, ২০১২) গ্রন্থে জানিয়েছেন:

'লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে বাইশ নং পুলিশ কোড জারি করলেন, যা বর্তমান থানা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থার ভিত্তি। কলকাতার জন্যে ১৭৯৩ সালে কলকাতার যে সমস্ত দারোগা নিয়োগ হল তাদের সবাই ছিল মুসলিম, মাত্র একজন ছিল হিন্দু। ১৮৫০ সালে প্রথম ভারতীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর নিয়োগ হয়েছিল। প্রথমজন শেখ মোলায়েম জোড়াবাগান থানার অফিসার ইনচার্জ...'

কাহিনির পটভূমি যেহেতু দেড়-শতাধিক বছরের পুরনো এবং যেহেতু লেখক এমন বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার কিছু কিছু

সেকালের আইনি লব্‌জে ব্যবহৃত হত এবং যার অধিকাংশ আজকের দিনে অচল, সেই হেতু প্রতি অধ্যায়ের শেষে কিছু ব্যাখ্যাত্মক টীকা সংযুক্ত হল। আশা করা যায় এই টীকাগুলি থেকে আধুনিক যুগের পাঠক কিছু সুবিধা পাবেন।

আনুমানিক ১৯০৫ নাগাদ বইটির একটি সংস্করণের পর অধ্যাপক সুকুমার সেনের সম্পাদনায় ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৮৩) নতুন করে প্রকাশিত হয় *বাঁকাউল্লার দপ্তর*। সেই সংস্করণটিও বহুদিন বাজারে নেই। অথচ সময়ে-অসময়ে গোয়েন্দা-কাহিনি পড়ে অহেতুক আনন্দ পান—এমন পাঠকের অভাব নেই বঙ্গদেশে। তাই বরকতউল্লা সাহেবের কীর্তিকাহিনি নতুন করে প্রকাশের এই উদ্যোগ। কাহিনিগুলিতে গোয়েন্দাকাহিনির সঙ্গে মিশে রয়েছে সেকালের সমাজ-জীবন এবং কিছু ইতিহাস।

অধ্যাপক সেন সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে এই গ্রন্থের পাঠ গৃহীত হয়েছে। বানানের রদবদল ছাড়া মূল পাঠের পরিবর্তন নেই বললেই চলে।

বইমেলা
২০১৩

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত
সৌম্যেন পাল

পূর্বাভাষ—আত্মকথা

লর্ড হেস্টিংস্[১] হইতে হার্ডিঞ্জ[২],—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির[৩] দেওয়ানি[৪] ও ফৌজদারি[৫] ভার গ্রহণ হইতে, বাঙ্গালা দেশে শান্তি-সংস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সে সময়ের দেশের অবস্থা, আধুনিক সুশাসিত প্রজা-লোকেরা ধারণায় আনিতেও পারেন না। সে বড় বিষম কাল। "জোর যার মুলুক তার" এই চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য তখন দেশের লোকের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল, প্রত্যক্ষ প্রমাণও হাতে হাতে মিলিত। চুরি ডাকাতি, জাল জুয়াচুরি, খুন জখমের ত কথাই ছিল না। তখনকার লোক একটা লোকের প্রাণনাশ করিতে, মশকবধের দ্বিধাও অনুভব করিত না। লোকের দেহে তখন অসীম শক্তি ছিল, শক্তির সহকারী সাহসও ছিল; সেই শক্তি সাহসে ধর্ম্মজ্ঞানহীন ইতর লোকেরা লোকের যথাসর্বস্ব লুঠিয়া খাইত। অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তানও এই জঘন্য জীবিকা অবলম্বন করিতেন, নেতৃত্ব করিতেন, কেহবা খুনে ডাকাতির আড্ডাধারী ছিলেন।

সে সকল এখন উপন্যাস। আমার নিজের জীবনে যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং সমকর্ম্মচারীদের মুখে যে সকল অনুসন্ধানবৃত্তান্ত শুনিয়াছি, তাহা অতি অদ্ভুত। অবসরকালে সে সকল বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি পথ খরচ করিয়া আমার দরিদ্র-কুটীরে পদার্পণ করেন; গল্প শুনিয়া স্তম্ভিত হন।

অন্যের কি কথা, অধুনা যে সকল কর্মচারী গোয়েন্দা-পুলিশে কার্য করিতেছেন, সে সকল উপাখ্যান তাঁহাদিগের পক্ষেও শিখিবার জিনিস।

বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের[৬] আমলেই কড়াকড়ির সূত্রপাত। ঠগী[৭] কমিস্যনর[৮] দেশে দেশে, নগরে নগরে—এমন কি প্রতি পল্লীর মাদ্রাসা[৯] পাঠশালায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; লোকের মুখে অনুসন্ধান লইতেছেন, একটু বনেদি বড়লোকের চালাক ছেলে পাইলেই, —কমিস্যনর বাহাদুর তাহাদিগকে দারগাগিরি[১০] দেবেন।

কোম্পানির শাসনাধীন দারগাগিরি বড় হইতেও বড় পদ। হাকিমত্ব হাকিম হইতেও অধিক। কি খ্যাতি প্রতিপত্তিতে, কি শাসনে জুলুমে, মানে সম্ভ্রমে থানার দারগারা জেলার বড় হাকিম হইতেও বড়। কমিস্যনর বাহাদুর এই লোভনীয় পদের জন্য দেশের চালাক চতুর ছোকরা খুঁজিতেছেন। যাহারা লায়েক, তাহাদের পক্ষে এ বড় সুসময়।

জেলার যিনি মীরমুন্সী[১১], সেই মুন্সী সাহেবের একটা মাদ্রাসা ছিল; সকালে বিকালে সাহেব পাঠ দিতেন, দশ বারটি ছাত্র আমরা মুন্সী সাহেবের নিকট পাঠ লইতাম। বয়স তখন আমার একুশ বাইশ। চৌহারা হাফেজ[১২] দেশ হইতে সারিয়া আসিয়াছিলেন, এখানে সরিফের[১৩] প্রায় তাবৎ বয়েৎ[১৪] কণ্ঠস্থ করিয়াছি; পাঠ সাঙ্গের আর বিলম্ব নাই।

বেশ মনে পড়ে, মাঘ মাস,—খুব শীত, রৌদ্রে বসিয়া ছাত্রদলে বকামী করিতেছি, মুন্সী সাহেব হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন, 'তুমি দারগা হইবে?'

মানে সম্ভ্রমে বা ক্ষমতা প্রতিপত্তিতে এ পদটি যে অদ্বিতীয়, তাহা দেশের বালবাচ্ছা সকলেই জানে; পয়সাও প্রচুর। ঘুষ-ঘাসের একটা সত্য মিথ্যাময় অপবাদ পুলিশের চরিত্রে চিরদিনই আছে সত্য, তথাপি

সৎ পথেও পয়সার অভাব ছিল না। চুরি ডাকাতি, জাল জুয়াচুরি, কি খুন জখমের মামলা কিনারা করিতে পারিলে, বিভাগীয় পুরস্কার ছিল অতি প্রচুর। তেমন তেমন মকর্দমার সুরৎহালের[১৫] জন্য, দারগারা পাঁচ সাতশত, হাজার টাকাও পুরস্কার পাইয়াছে, জানি। তখনও এ কথা শুনিয়াছিলাম। এ হেন চাকরির প্রস্তাবে পরম আনন্দিত হইয়া কহিলাম, 'মেহেরবাণী হয় ত করিব।' মুন্সী সাহেব বলিলেন, 'এক বাজে কমিস্যনর সাহেবের সহিত মোলাকাৎ করিও। মোনাসেব[১৬] নোকরি পাইবা।'

দেখা করিলাম, মনোনীত হইলাম; স্থূল স্থূল উপদেশ লইয়া পরদিন হইতেই কাজে বাহির হইলাম। পদ পাইলাম গোয়েন্দা-পুলিশের দারগাগিরি। এলাকা, সমস্ত বঙ্গদেশ। প্রয়োজন হইলে বিদেশ গমনেও বাধা নাই। দেশের সর্বত্রই চুরি ডাকাতি,—খুন খারাপি হইতেছে, দেশে দেশে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া তাহার অনুসন্ধানই প্রধান কার্য; তৎসহ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর প্রয়োজনমত আদেশ পালন। কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

টীকা

১. **লর্ড হেস্টিংস**: ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮)। ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত ভারতে গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে বক্সারের যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীর কাশিমকে পরাস্ত করে বস্তুত এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েম হয়। এর আগে তিনি মুর্শিদাবাদে ইংরেজদের প্রতিনিধি ছিলেন, এদেশে প্রথম আগমন ১৭৫৮ সালে, ১৭৬৪ সালে তিনি ইংল্যান্ড ফিরে যান। গভর্নর জেনারেল হয়ে ফিরে আসেন।

২. **হার্ডিঞ্জ**: স্যার চার্লস হার্ডিঞ্জ, ফার্স্ট ব্যারণ হার্ডিঞ্জ অব পেনহার্স্ট (১৮৫৮-১৯৪৪)। ভারতে ভাইসরয় ছিলেন ১৯১০ থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর তাঁর আমলে ঘটেছিল। কিন্তু বাঁকাউল্লা-বর্ণিত হার্ডিঞ্জ আবশ্যিকভাবে ফার্স্ট ভাইকাউন্ট অব হার্ডিঞ্জ, হেনরি হার্ডিঞ্জ (১৭৫৮-১৮৫৬) যিনি ভারতে গভর্নর জেনারেল ছিলেন ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

৩. **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি**: ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অংশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো এবং পরিচালনার কারণে গঠিত ইংরেজ সংস্থা, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানিকে দেওয়া ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের রাজকীয় সনদ (Royal Charter) অনুসারে কোম্পানি পূর্ব ভারতে তুলা, নীল, রেশম, লবণ, চা, আফিম, প্রভৃতির ব্যবসা পরিচালনা করত। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির অংশীদার বা সদস্য ছিলেন না তবে সরাসরি কোম্পানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতেন। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে, অর্থাৎ ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী বছর পর্যন্ত পূর্ব ভারত ছাড়াও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কায়েম হয়। কোম্পানির নিজস্ব সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, শাসন-ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা; এমনকী মুদ্রা-ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। ১৮৫৮-এ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট প্রণয়ন করে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং কোম্পানির আমলের অবসান ঘটে শুরু হয় ব্রিটিশ রাজ।

৪. **দেওয়ানি**: যে সকল আইন বা বিচার-ব্যবস্থা অপরাধ-ঘটিত বা অপরাধ সংক্রান্ত নয়। Civil। অর্থাৎ জমিজমা বা সম্পত্তির দাবি সংক্রান্ত আইন, জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক বিষয়ক আইন, প্রভৃতি। বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন ও বিচারকেও দেওয়ানির অন্তর্গত হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫. **ফৌজদারি**: Criminal। অপরাধ-সংক্রান্ত আইন এবং বিচার, যার সঙ্গে পুলিশ বা অন্য আইন-রক্ষাকারী সংস্থার পূর্ণ যোগাযোগ থাকে।

৬. **বেন্টিঙ্ক বাহাদুর**: লর্ড উইলিয়ম হেনরি ক্যাভেন্ডিস-বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯), সমধিক পরিচিত লর্ড বেন্টিঙ্ক নামে। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত ভারতে গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ভারতে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তা ছাড়া ভারতে প্রচলিত আইন-ব্যবস্থার বিশেষ রদবদল করেন তিনি। তাঁর উদ্যোগে এদেশের উচ্চ-আদালতে ফারসি ভাষার বদলে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার প্রচলিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ তাঁর ছিল না। শোনা যায়, তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আয় বাড়াতে তাজমহল-এর মার্বেল পাথর বিক্রি এবং আকবরের যুগে নির্মিত বিশাল কামান, গ্রেট আগ্রা গান গলিয়ে ধাতু বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন।

৭. **ঠগী**: ঠগ বা দস্যু সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে দস্যু বা দুর্বৃত্তদের উপদ্রব বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তা চরমে পৌঁছয়। এই দস্যুরা দল বেঁধে পথিকের ছদ্মবেশে অন্য পথিকদের সঙ্গে আলাপ জমানোর পর সুযোগ বুঝে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে তাদের হত্যা করত। এক টুকরো কাপড়ের কোণে পাথর-জাতীয় ভারি কিছু বেঁধে ভারি প্রান্তটি ছুঁড়ে পথিকের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা ছিল এই দস্যুদের বিশেষত্ব। এদের বলা হত ঠগী। ঠগী দমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক। ১৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দের জিয়াউদ্দিন বারাণি-তে 'ঠগী'-র উল্লেখ প্রথম পাওয়া গিয়েছিল।
১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক 'ঠগী অ্যান্ড ডেকয়েটি ডিপার্টমেন্ট' নামে আলাদা একটি প্রশাসনিক বিভাগের সূত্রপাত ঘটান। সেই বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট নিযুক্ত হন বেঙ্গল আর্মির প্রাক্তন অফিসার উইলিয়ম হেনরি স্লীম্যান। স্লীম্যানের দক্ষতায় সরকার ঠগীদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সমর্থ হন।

আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য সর্বত্রই একসময় ঠগী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে গণ্য হত। ঠগীরা সাধারণত দল বেঁধে থাকত। তবে, দেশের সমস্ত ঠগীর যে কোনও মহাসংঘ বা সমিতি ছিল সে-ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া, অনেকে, বিশেষত বিদেশিরা, মনে করতেন ঠগীরা বিশেষ কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সে-ধারণার স্বপক্ষেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। স্লীম্যানের বাহিনীর হাতে ধরা পড়া এক ঠগী, সৈয়দ আমির আলির স্বীকারোক্তি অবলম্বনে ব্রিটিশ লেখক ফিলিপ মিডোজ টেলর-এর লেখা 'কনফেশনস্ অব আ ঠগ' উপন্যাসে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

৮. **কমিস্যনর**: লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 'ঠগী অ্যান্ড ডেকয়েটি ডিপার্টমেন্ট'- এর সুপারিনটেন্ডেন্ট উইলিয়ম হেনরি স্লীম্যান ওই বিভাগের কমিশনার পদে উন্নীত হন ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। স্লীম্যানের কার্যকালে প্রায় চোদ্দো'শো ঠগীকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয় অথবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। এর আগে স্লীম্যান (১৭৮৮-১৮৫৬) ছিলেন বেঙ্গল আর্মির অফিসার এবং পরে মধ্যপ্রদেশের সাগর ও নর্মদা অঞ্চলে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি থাকাকালীন এশিয়ার প্রাচীনতম ডায়নোসরের জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন জব্বলপুরের নিকটবর্তী এলাকায়।

৯. **মাদ্রাসা**: মসজিদ-কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষাদান কেন্দ্র। উৎপত্তি আরবি 'দার্‌স' শব্দ থেকে যার অর্থ শিক্ষাদান। এদেশে সরকারি অর্থানুকূল্যে স্থাপিত এবং সরকার পরিচালিত প্রথম মাদ্রাসা কলকাতায় ১৭৮১ সালে স্থাপিত হয়।

১০. **দারগাগিরি**: তুর্কি শব্দ দারোগার অর্থ পুলিশ, আবগারী বা কাস্টমস-এর কোনও থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। কখনও পুলিশের সাব- ইন্সপেক্টরকেও দারোগা বলা হয়ে থাকে।

১১. **মীরমুন্সী**: আরবি মুনশি শব্দের অর্থ লেখক বা কেরানি ছাড়া বিদ্বান-ব্যক্তি বা উর্দুশিক্ষক। 'মীর'-এর অর্থ প্রধান। এক্ষেত্রে প্রধান বা মুখ্য উর্দু-শিক্ষক হওয়া সম্ভব।

১২. **হাফেজ**: সম্পূর্ণ কোরান যারা মুখস্থ রাখেন তাদের বলা হয় হাফিজ। হজরত মহম্মদ ছিলেন নিরক্ষর। তিনি আল্লার কাছে উপদেশ শুনে সেগুলি অন্যদের বলতেন এবং এভাবেই কোরান মুখস্থ রাখার প্রচলন ঘটে। যাঁরা মুখস্থ রাখতেন তাঁদের হাফিজ বলা হত। একবার এক যুদ্ধে বহু হাফিজের মৃত্যু হলে লিখিত কোরান তৈরি করা হয়।

১৩. **সরিফ**: সরিফ বা সারিব কোরানেরই এক নাম।

১৪. **বয়েৎ**: সংস্কৃতে যেমন শ্লোক, বাংলায় যেমন পদ, উর্দু এবং ফারসি ভাষায় তেমনই হল বয়েৎ।

১৫. **সুরৎহাল**: প্রাথমিক অনুসন্ধান; ঘটনাস্থলে সাক্ষ্য বা এজাহার গ্রহণ, প্রমাণ সংগ্রহ এবং তার ভিত্তিতে করা অনুসন্ধান।

১৬. **মোনাসেব**: আরবি 'মুনাসিব'-এর অপভ্রংশ, যার অর্থ 'উপযুক্ত' বা 'পছন্দসই'।

হাতকাটা হরিশ

ভীষণ নরহত্যা—তিন খুন

সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া, ভ্রমণকারীর বেশে যাত্রা করিলাম। সরকারি কাগজপত্র, বহালী পরওয়ানা[১], কমিস্যনর বাহাদুরের স্বাক্ষরিত হুকুম নামা[২],—সমস্তই একটা বড় গনিব্যাগে[৩] পূরিয়া প্রভাতেই নবদ্বীপে[৪] যাত্রা করিলাম। এমন অনেক অনেক সত্য-মিথ্যার ব্যবহার আছে, পুলিশ বিভাগে যাহা 'হিক্‌মতি'[৫] নামে সমাদৃত। নবদ্বীপে গিয়াই জাতি ভাঁড়াইলাম। মাঘী পূর্ণিমার[৬] আর দিন নাই; গৌরাঙ্গ ভক্তেরা, বৈষ্ণব বাবাজিরা, সঙ্গে সঙ্গে তরুণ তরুণী বৃদ্ধবৃদ্ধা হিন্দু-নরনারীরা, দলে দলে আসিয়া নবদ্বীপবাসী হইয়াছে। সপ্তরাত্রি[৭] নবদ্বীপ প্রবাসে পরম পুণ্য।

আমি বাসা লইয়াছি, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বাবাজির আখ্‌ড়ায়।[৮] আখ্‌ড়া প্রাচীর আঁটা; প্রাচীরের গায়ে দৌড়দার চালা[৯], আর তিনখানি ঘর। বাবাজির তিন সেবা-দাসী, তাঁহারা থাকেন এক ঘরে; ছোটখানি আমি ভাড়া লইয়াছি, আর একখানি তালাবদ্ধ। চালার খোপে খোপেও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র যাত্রীরা আছে। আমি যে দিন নবদ্বীপে পৌঁছি, তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় সর্বাঙ্গ তুলা ভরা অঙ্গরাখায়[১০] ঢাকা, পায়ে লোমশ বিনামা[১১], হস্তে প্রকাণ্ড যষ্টি, বছর ত্রিশ বয়সের এক গৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পাহাড়ি চাকর। চাকরটার রং কাল মিশ; গোঁপগুলা যেমন মোটা তেমনই লম্বা, উপরের দিকে খাড়া; চক্ষু লাল—ভাঁটার মত গোল; দৃষ্টি যেমন কর্কশ তেমনি তীব্র

লম্বা ঝাড়া পাঁচ হাত। ব্রাহ্মণ আসিয়াই আখ্‌ড়ার সেই রুদ্ধগৃহের দ্বার উন্মোচন করিলেন; ভৃত্য জিনিসপত্র রাখিল। বুঝিলাম, ভাড়া করা ঘর। ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিয়া বসিলেই আখ্‌ড়াধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভুর ইচ্ছায় সুসুদ্ধি?' ব্রাহ্মণ গম্ভীর বদনে বলিলেন, 'শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কৃপায় সুসুদ্ধি।' বাবাজি নিজেই বলিলেন, 'বাবু শ্রীচন্দ্রনাথ[১২] যাত্রা করিবেন, তাই মহাজনের নিকট সুদের টাকা আনিতে গিয়াছিলেন।'

বাবাজির ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিলাম। কথা প্রসঙ্গে জানিলাম, ব্রাহ্মণ বাবাজির পরিচিত। পালপার্বণে ব্রাহ্মণ শ্রী নবদ্বীপ ধামে আগমন করেন। পরিচয়-প্রসঙ্গে বাবাজি আরও বলিলেন, 'ইনি খুব বড়-লোকই ছিলেন, এখন সংসার বিবাগী পরিব্রাজক। পূর্বে ঢাকা জেলায় জমিদারি ছিল; বড় চক্‌মিলান দোতালা বাড়ি ছিল, এখন সে সব কিছু নাই। কিছু নগদ টাকা মাত্র মহাজনি আড়তে জমা আছে, তাহারই সুদে ব্রাহ্মণ দেশ-ভ্রমণ করেন। বহুদেশ পর্যটনে ব্রাহ্মণের প্রচুর বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে। নাম হরিশভট্ট।'

অধ্যয়নকালে সুলোমনের 'দুনিয়া হদিশী'[১৩] পড়িয়াছিলাম, দেশ বিদেশের নূতন নূতন কথা সেই হইতেই আমি বড় ভালবাসি। আহারান্তে ভট্ট মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিলাম; খাসা লোক। পণ্ডিত লোক। অতি সদালাপী, অতি অমায়িক, অতি মিষ্টভাষী। পরিচয়ে পরিতুষ্ট হইলাম। অতি দিব্যকান্তি, বড় লোকই বটেন; দুঃখের বিষয়, দক্ষিণ হস্তখানি নাই!—একেবারেই নাই! কুর্তার শূন্যগর্ভ হস্ত পাশে ঝুলিতেছে! কৌতূহলি হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলাম; ভট্ট মহাশয় যেন দুঃখিত হইলেন; বলিলেন, 'সে অনেক কথার কথা, আর একদিন বলিব।' আর পীড়ন করিলাম না।

এমন চেহারা, হাতখানি নাই। দেহের প্রধান কর্মিষ্ঠ অঙ্গ যে দক্ষিণ হস্ত, সেই হস্তখানিই নাই! বড় কষ্টের কথা। কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল; সে কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না, পরদিন পুনরায় সেই কথা উত্থাপন করিলাম। শুনিলাম, পশুপতিনাথ[১৪] দর্শন হইতে ফিরিবার পথে, নেপালের জঙ্গলে জংলি-ডাকাতে ব্রাহ্মণের সর্বস্ব লুটিয়া লইয়াছে, সেই ডাকাত দলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া, ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তখানি কাটা গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ বড় লাজুক লোক। রন্ধন ভোজন—কি বেশ পরিবর্তন, সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে। লোকের সম্মুখে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বামহস্তে সারিতে তিনি নিতান্তই নারাজ। নারাজ ত নারাজ, কে তাহার জন্য চিন্তিত? চার পাঁচ দিনে আমার সহিত ব্রাহ্মণের বেশ সখ্যতা জন্মিল দেশ-বিদেশের—নানা তীর্থস্থানের অনেক উপাখ্যানই শুনিলাম।

একদিন অপরাহ্নে আখড়ায় ঢুকিতেছি, দেখি, ব্রাহ্মণের সেই পাহাড়ী ভৃত্য খান দুই তিন পত্র ডাক অফিসে দিতে যাইতেছে। চিঠির দিকে নজর পড়িতেই দেখিলাম, বেশ টানা লেখা। এ পত্র তবে কে লিখিল? সহসা মনের মধ্যে কেমন একটা ধোঁকা লাগিল। আখড়ায় এমন লেখার লেখক ত কেহ নাই! হরিশ ত হাত-কাটা হরিশ।

যে কার্য সাধনের জন্য কোম্পানির বেতন ভোগী হইয়াছি, সে সব কথা বেশ মনে আছে। থানায় গিয়া আলাপ পরিচয়ও করিয়া আসিয়াছি, আজ তথায় নিমন্ত্রণ। অন্যত্র ভ্রমণে গিয়াছিলাম, বাসায় আসিয়াছি, বেশ পরিবর্তনের জন্য। পথেই, আখড়ার দরজার অদূরেই পত্রহস্ত পাহাড়ি ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ। প্রবেশ করিয়াই

শুনিলাম, হরিশবাবু সেই রাত্রেই নবদ্বীপ ত্যাগ করিবেন। যাইবেন, চন্দ্রনাথ। সাক্ষাৎ করিলাম, সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন; হয় ত এ জীবনে আর পুনঃদর্শনলাভ ঘটিবে না বলিয়া সমবেদনা জানাইলাম, বিদায় লইলাম।

থানায় আহারাদি সারিতে একটু রাত্রি হইল। আখ্‌ড়া হইতে থানা একটু দূরবর্তীও বটে। দারগাবাবু লোকলষ্ঠনে সাহায্য করিতে চাহিলেন, প্রয়োজন বোধ করিলাম না। গোয়েন্দা-পুলিশের কর্মচারী আমরা, আমাদের আর কি ভয়ভীতি থাকিলে চলে? কাকজ্যোৎস্না[১৫] রাত্রি, একবার আলো—একবার আঁধার। সেই আলোকে-আঁধারে বঁইচড়াপাড়ার পথে চলিয়াছি। যাইতেছি, হঠাৎ সাঁ করিয়া পাশ ঘেঁসিয়া একটা লোক চলিয়া গেল। লোকটার আপাদমস্তক ঢাকা, মাথায় বড় পাগড়ি; কেবল চোক্ দুটিমাত্র দেখা যায়। নজরও পড়িল সেই চোকের দিকে—যেন চেনা চোক্। ঠিক মনে আসিতেছে না, অথচ যেন মনে হইতেছে,—এ চক্ষুর অধিকারী আমার পরিচিত। সেই চেনা চক্ষুর অধিকারী, পরিচিতির পাশ ঘেঁষিয়া এত দ্রুতই বা গেল কেন? সমস্ত পথ চিন্তা, অধিকারীকে মনে পড়িল না। বাসায় আসিয়া শুনিলাম, হরিশবাবু চলিয়া গিয়াছেন।

প্রভাতে উঠাই অভ্যাস; অভ্যাসমত প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াছি; অস্ফুটস্বরে একটা হাফেজের[১৬] গজল[১৭] গাহিতে গাহিতে আখ্‌ড়ার দরজায় পদচারণ করিতেছি, শুনিলাম, বঁইচড়াপাড়ায় খুন হইয়াছে। রামতারক ভট্টাচার্য্যের কন্যা বিধুমুখীকে কে খুন করিয়াছে। শুনিয়াই দেখিতে চলিলাম। রামতারক, সেই সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামতনু ভট্টাচার্য্যের পুত্র, বর্দ্ধিষ্ণু লোক। বৃদ্ধ জীবিত, তাঁহার পৌত্রী খুন হইয়াছে! দেখিলাম অপূর্ব সুন্দরী। বয়স

কুড়ি বাইশ, সন্তান হয় নাই;—সুন্দরীর সৌন্দর্য-পরিচয় অসামান্য। অকুস্থান, বাড়ির সংলগ্ন উদ্যান—সেই উদ্যানের মধ্যবর্তী পুষ্করিণীর চাতাল। বিধুমুখীর চরিত্রের উপরই প্রথম দৃষ্টি পড়িল। চরিত্রহীনা না হইলে সে এমন স্থানে মরিবে কেন? পুলিশ আসিলেন, যথাবুদ্ধি তদন্ত করিলেন, ফল হইল না; অগত্যা শেষ নিষ্পত্তি—অজ্ঞাত আসামি ফেরার। পূর্ণিমার স্নানযাত্রী, পূর্ণিমা ফুরাইতেই সকলে দেশের দিকে চলিল, আমিও চলিলাম। বিধুমুখী খুন হইল, অথচ অনুসন্ধান হইল না; আমি তথায় আছি, আমিও কিছু করিতে পারিলাম না; এ বড় দোষের কথা। সেই দোষের ভয়েই নবদ্বীপ ছাড়িয়া শান্তিপুরে[১৮] আসিলাম।

শান্তিপুরেও বাসা পাওয়া যায়। বাসা পাইলাম। হপ্তার জন্য বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছি, হঠাৎ দেখি, সেই হাতকাটা হরিশ! সাম্‌না-সাম্‌নি সাক্ষাৎ, চারিচক্ষে মিলন, হরিশবাবু কথা কহিলেন না। আমিও না। ভাবিলাম, অন্য সময়ে দেখা করিব, আপাততঃ বাসাটা চিনিয়া আসি। দূরে দূরে অনুসরণ করিয়া, বাসা দেখিয়া আসিলাম। চন্দ্রনাথ-যাত্রী হরিশ শান্তিপুরে কেন, এত ব্যস্তসমস্তই বা কেন, কথাই বা কহিলেন না কেন; ভাবিয়া পাইলাম না।

পরদিন প্রভাতেই হরিশের বাসার দরজায় হাজির। সেই চাকর, দরজায় প্রহরী। চাকরের দিকে চাহিতে চাকরের চক্ষের দিকে দৃষ্টি পড়িল;—দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে যেন কেমন মিলিয়া গেল, মনে পড়িল, সেই বঁইচড়াপাড়ার পথের দুই-চক্ষু। প্রাণের ভিতর যেন সন্দেহের তরঙ্গ উঠিল। সন্দেহের মন হরিশকেও সন্দেহের তুলায় আনিয়া দাঁড় করাইল, সন্দেহ ক্রমে বদ্ধমূল হইল। সেই বদ্ধমূল সন্দেহ লইয়া হরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

হরিশবাবুর সহিত অন্যান্য কথোপকথনের সময় বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম—তা'ত নয়! হাতকাটা হরিশ ত নয়। বেশ বুঝিলাম হরিশের হাত আছে; কথা কহিবার সময় তুলাভরা মেরজাই এর ভিতর সে হাত অল্প অল্প নাড়িতেছে!

হরিশবাবু স্বয়ংই বলিলেন 'চন্দ্রনাথ যাওয়া ঘটে নাই। এখানে একটি আত্মীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসা; সে আশা মিটিয়াছে অদ্যই রওনা হইব। গাড়ি প্রস্তুত।'

দাওয়ায় বসিয়া দুই জনে কথাবার্তা চলিতেছে, ঘরের ভিতর সেই ভৃত্যটির গমনের আয়োজন—জিনিসপত্র সব বাঁধাছাদা করিতেছে; হঠাৎ—ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইল, দুজনেই চাহিলাম। দেখিলাম, একটা বাক্স, বোধহয় ভৃত্যের হাত ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছে;—পড়িয়াই খুলিয়া গিয়াছে; ভিতরের জিনিস বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে সব জিনিস, দাড়িগোঁপ, পরচুল, রঙের খুরী, তুলি আর নানা রকমের মালা। বাক্সটি এক রকম বহুরূপীর ঝাপি। তীর্থ পর্যটনের আবার এ সকল কেন? হরিশবাবু ত অগ্নি-অবতার! পাহাড়ি ভাষা বুঝি না, চাকরটাও বাঙালা হিন্দি কি উর্দু কিছুই বুঝে না; হরিশবাবু পাহাড়ী ভাষাতেই ভৃত্যকে ধমক দিলেন; সে জড়সড় হইয়া সেই সব গুছাইয়া তুলিতে লাগিল। হরিশবাবু বলিলেন, 'দেশভ্রমণে এ সব সরঞ্জাম চাই-ই চাই। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে জাতিধর্ম গোপন না করিলে তিষ্ঠিতে পারা যায় না; এমন কি মাথা গুঁজিবার স্থানও মিলে না।' অন্যান্য কথার পর বিদায় হইলাম।

জানি, হরিশবাবু বৈকালে রওনা হইবেন, আর সাক্ষাৎ করিতে গেলাম না। তবে লোকটার উপর কেমন একটা সন্দেহ দাঁড়াইল! কথার ভাবে, চেহারার ভাবে, সাজ-সরঞ্জামের ভাবে বেশ বুঝিলাম,

লোকটা বহুরূপী; কিন্তু হরিশের এ বহুরূপ পরিচ্ছেদ কেন, ভাল হাতখানি লুকাইয়া রাখাই বা কেন, সন্দেহ হইল। বহুরূপীর অনুসরণ করিব কি?

সকালেই শুনিলাম, খুন! মেয়েমানুষ—ভদ্রঘরের যুবতী মেয়ে-মানুষ পথের মাঝে খুন! খুব দ্রুতপদে হরিশবাবুর বাসায় গেলাম; কেন গেলাম জানি না, তবে গেলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, হরিশবাবু নাই। এইখানেরই একখানি গো-শকটে তিনি কাল্‌না রওনা হইয়াছেন। হতাশ হইয়া, শেষে যে পাড়ায় খুন হইয়াছে, সেই পাড়ায় চলিলাম। হাঁ, খুনই বটে। লাশ তখনও সেই পথের মাঝে পড়িয়া আছে; শবদেহ রক্তে ভাসিতেছে; মৃতার সুন্দর-বর্ণ রক্তের দাগে যেন আরও লাল বলিয়া বোধ হইতেছে; সুন্দরী বটে। একটু অভিনিবেশের সহিত দেখিলাম, খুনের রকম সেই নবদ্বীপেরই তুল্য। গলার নলিটি বামে দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে কাটা। মৃতা বিধবা। বিধবার শ্বশুরের মুখে শুনিলাম, বয়স এই সবে উনিশ। স্থানীয় পুলিশের তদন্তে, পাড়ার লোক সকলেই একবাক্যে বলিল, 'এমন বউ আর হয় না। পনের বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছে, এ পর্যন্ত সে একবার মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহে নাই। কেমন কপাল—ভগ্নী, ভগ্নীপতিটিও এই রকমে মারা গেল।' শুনিলাম, বিধবা শশিমুখী নবদ্বীপের সেই বিধুমুখীর সহোদরা ভগ্নী।

শশিমুখীর ঘর খানামসরা[১৯] হইল। তাহার নিজের বাক্স, তাহারই আঁচল হইতে চাবি লইয়া খোলা হইল, প্রেমলিপি মিলিল। লিপি লেখক লিপিতে নাম লিখে নাই; ইঙ্গিতে কেবল 'তোমারই ভানু' এইটুকু লেখা আছে। পুলিশের অনুসন্ধান—এক প্রহরেই জানা গেল, 'ভানু' নামে কোনও লেখক-লোক শান্তিপুরে নাই। এক 'ভানু'

আছে, সে গোয়ালা,—লিখিতে পড়িতে জানে না। বুঝা গেল, 'ভানু' একটা কল্পিত নাম। পুলিশ এই 'ভানুর' অনুসন্ধানই করিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশী একটি ভদ্রলোক বলিলেন, 'রাত্রি যখন দুই প্রহর অতীত, তখন বাজার পাড়া হইতে আমি পাশা খেলিয়া আসিতে-ছিলাম। ঠিক এই পথেরই মোড়ে, একটা লোককে আমি খুব দ্রুত পদে যাইতে দেখিয়াছি! লোকটার আগাগোড়া কাপড় মোড়া, মাথায় মস্ত পাগড়ি, কেবল মুখের খানিক খোলা। খুব বড় বড় চোক; খুব বড় বড় গোঁফদাড়ি—পুরা পাঁচ হাত জওয়ান।'

আর একটি স্ত্রীলোকও ঠিক এই কথাই বলিল। আমার কিন্তু সন্দেহ হইল। বড় বড় চোখের কথা শুনিয়া, হরিশবাবুর সেই পাহাড়ি-ভৃত্যের কথা মনে পড়িল; কিন্তু তাহার ত দাড়ি ছিল না?

সে বেলার মত অনুসন্ধান শেষ করিয়া দারগাবাবু থানায় রওনা হইলেন, আমিও বাসায় আসিলাম। আসিবার পথে একবার সেই গাড়িবানের বাড়ি দিয়া আসিলাম। তখনও সে ফিরে নাই।

অপরাহ্ন সময়ে আর একবার অকুস্থানে হাজির হওয়া গেল। পাড়ায় পাড়ায় আরও একবার 'ভানুর' অনুসন্ধান হইল,—নিষ্ফল! শশিমুখীর চরিত্র সম্বন্ধে কোনও মন্দ কথা, এক প্রাণীও বলিল না। দারগাবাবু অগত্যা খতম রিপোর্ট[২০] দিতে বাধ্য হইলেন।

ফিরিবার পথেই গাড়িবানের বাড়ি। গিয়া দেখি, সেই সবে মাত্র সে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলদ দুটিকে নাদার কাছে বাঁধিয়াছে, গাড়ির ভিতর খড়বিচালি তখনও বিছানই আছে। প্রথমেই সেই গাড়িতে গিয়া বসিলাম। আমিও কাল্‌না[২১] যাইব, এই অভিপ্রায়ই প্রথমে প্রকাশ করিলাম। ভাড়া হইল, দুই টাকা। গাড়িবান বলিল, 'এই মাত্র

কাল্‌না হইতেই আসিতেছি। এক বাবুকে এই এখনি রাখিয়া আসিতেছি। আমার আরও একজোড়া ভালো বলদ আছে, আজই যাইতে পারিব।'

কথা বলিতেছি, কিন্তু দৃষ্টি আছে গাড়ির ভেতর। জ্যোৎস্না তখন উঠিয়াছে, সেই জ্যোৎস্নার আলোক গাড়ির ভিতরেও পড়িয়াছে; সেই সামান্য আলোকে দেখিতে পাইলাম, গাড়ির একধারে কি একটা কাল পদার্থ পড়িয়া আছে। গাড়িবান বাড়ির ভিতর তামাক সাজিতে গেল, আমিও সেই অবসরে কাল জিনিসটা টানিয়া বাহির করিলাম; সেটা দাড়ি। আর যাবে কোথায়? সমস্ত ঘটনাটা যেন স্পষ্ট স্পষ্ট মনে পড়িল। এত তাড়াতাড়ি সব কথা মনে পড়িল যে, সে সকল কথা ভাল করিয়া গুছাইয়া লইতে পারিলাম না। এদিকে গাড়িবান আসিয়া উপস্থিত। রাত্রেই রওনা হইব বলিয়া, তখনই বাসায় আসিলাম। আলো জ্বালিয়া ভাল করিয়া একবার দাড়িটা দেখিয়া লইলাম। আনন্দিত হইলাম। যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি সারিয়া, সেই রাত্রেই কাল্‌না রওনা হইলাম।

পথে আরও অনেক অনুসন্ধান মিলিল। হরিশবাবু রওনার রাত্রি গুপ্তিপাড়াতেই[২২] ছিলেন। গুপ্তিপাড়ার একটা বাগানের মধ্যেই গাড়ি রাখিয়া, সেই স্থানেই জলযোগ করিয়াছিলেন; সে জলযোগের অংশও গাড়িবান পাইয়াছিল। জলযোগ সারিয়া সেই বাগানেই নিদ্রা। গাড়িবান আর কিছু জানেন না। শেষরাত্রে বাবুই তাহাকে জাগরিত করেন, সেই শেষ রাত্রেই রওনা হন।

গাড়িবানকে দাড়ির কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলল, বাবুর চাকরের দাড়ি ছিল। কাল্‌নায় পৌঁছিয়া কিন্তু সে তাহার দাড়ি দেখে নাই। চাকরের তখন দাড়ি ঢাকা পাগড়ি বাধা ছিল—মনে মনে বেশ

বুঝিলাম, প্রতিবেশীর কথা সত্য। পাহাড়ি এ খুন পর্বের নায়ক।

কাল্‌নায় পৌঁছিলাম, পরদিন দশটায়। মনে করিয়াছিলাম, গমনমাত্রেই সন্ধান পাইব, ঘটিল না! অনাহারে সমস্ত দিন ঘুরিয়া থানায় আসিলাম, সন্ধ্যার সময়। আহারান্তে বড় পরিশ্রান্ত বোধ হইতে লাগিল, বিশ্রাম করিলাম। একটু গভীর রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, প্রস্রাব ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে বাহির হইয়াছি,—বারান্দা হইতে নীচে নামিব—সহসা থানার পূর্বদিগের বড় রাস্তার উপর নজর পড়িল। একটা লোক ঠিক সেই আড়ার—হরিশবাবুর পাহাড়ি ভৃত্য যে আড়ার ঠিক সেই আড়ার—আগাগোড়া কাপড়-মোড়া, উত্তর হইতে দক্ষিণে খুব দ্রুতগতি—অথচ নিঃশব্দে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। যেন কোনও অলৌকিক শক্তি আমাকে ঠেলিয়া নীচে নামাইয়া দিল; ভাবিবার অবসর পাইলাম না।—একবস্ত্রে অনুসরণ করিলাম; পায়ের চটি হাতে লইতে হইল।

লোকটা বিলক্ষণ চতুর; বুঝিল, পাছু লোক হাঁটিতেছে। কাল্‌নার দক্ষিণ সড়ক ঘুরিয়া, লোকটা পশ্চিমবাহী হইল; আমিও তদনুবর্তী হইলাম। বামে একটা ছোট ঝোপ, দক্ষিণে একটা পুলের বাঁধ; ঠিক সেই স্থানে আসিয়া চলন্ত লোকটি দাঁড়াইল, আমিও দাঁড়াইলাম। নক্ষত্র বেগে লোকটা আসিয়া, আমাকে খুব জোরে একটা ধাক্কা দিল, ধাক্কা খাইয়া পড়িলাম না, দশ হাত পিছু হটিয়া গেলাম; কিন্তু চিনিলাম; লোকটা সেই-ই বটে। ধাক্কার ক্লেশ তখন আমলেই আনিলাম না; ছুটিয়া গিয়া পাহাড়িকে জড়াইয়া ধরিলাম। পাহাড়িটা পাহাড় জওয়ান। তরুণ বয়সেও তখন আমার তেমন শক্তি ছিল না যে পাহাড়িকে ধরিয়া রাখি, অক্লেশে মুক্ত হইয়া পাহাড়ি পশ্চিম দিকে ছুটিল, আমিও পশ্চাতে দৌড়াইলাম।

বুড়ো শিবের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া লোকটা সহসা অদৃশ্য হইল। এই মানুষ আমার আগে আগে বেশ দ্রুতবেগে দৌড়িতে ছিল, সহসা সে যেন কোথাও মিশিয়া গেল! আতিপাতি অনুসন্ধান করিলাম, একস্থানে দশবার ঘুরিলাম,—পাইলাম না; লোকটা তবে গেল কোথা?

খুঁজিতেছি, মন্দিরগুলির চারিপাশ অনুসন্ধান করিতেছি, সহসা উত্তরপাড়ায় গোল, দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্জের পুত্রবধু খুন হইয়াছে। গোল শুনিয়াই মনের গোল গেল;—বুঝিলাম, হাতকাটা হরিশই এই তিন খুনের মূল। গোল শুনিয়া মন্দিরের সম্মুখ দিয়া একজন চৌকিদার ছুটিয়া গোলের দিকে যাইতেছিল; তাহাকে বলিয়া দিলাম 'যদি আসামি গেরেপ্তারের ইচ্ছা থাকে, দারগাবাবু যেন খুনের সুরৎহাল রাখিয়া দলেবলে এই দিকে আসেন। আসামি এইখানেই লুকাইয়া আছে।'

চৌকিদার বাতাসে ভর করিয়া ছুটিল। দণ্ডের ভিতরই দারগা বকসী কনষ্টেবল চৌকিদারে বুড়োশিবতলা ভরিয়া গেল; রীতিমত বাতাবন্দি[২৩] করিয়া, জালসেচা[২৪] ধরণে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। বুড়োশিবের মন্দিরের উভয় পার্শ্বে আরও অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। সকলের শেষের একটা অর্ধ-ভগ্ন মন্দিরে আসামি মিলিল। প্রভু ভৃত্য দুজনেই গেরেপ্তার, বিনাবাক্যব্যয়ে বাঁধিয়া চালান। এদিকে খুনের সুরৎহাল আরম্ভ হইল। দারগাবাবুকে আসামির হেফাজত ও এজেহারাদি লইবার ভার দিয়া আমিই এ তদন্তভার নিজের হাতে লইলাম। আসামি যখন ধরা পড়িয়াছে,—মনের সকল সন্দেহই যখন সত্য-সন্দেহ বলিয়া বুঝিয়াছি, তখন তদনুকূলেই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। অনুসন্ধান শীঘ্রই শেষ হইল না। আসামি গেরেপ্তারের সংবাদ ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাদিগের নিকট পাঠাইয়া, আসামি

লইয়া শান্তিপুর ও নবদ্বীপ ঘুরিয়া আসিলাম। প্রায় সপ্তাহ কাল অনুসন্ধানে কাটিল।

অনুসন্ধানে জানা গেল, দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্জে, আর শান্তিপুরের বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপের রামতারক ভট্টাচার্য্যের বেহাই। রামতারকের চারি কন্যা—বিধুমুখী, শশিমুখী, সুধামুখী আর সোনামুখী। নবদ্বীপেরই অদূরবর্ত্তী এক গ্রামে বিধুমুখীর বিবাহ হয়। বিধুমুখী রামতারকের স্নেহের প্রথমা কন্যা, শ্বশুরঘর করিত না। শশিমুখী, শান্তিপুরের বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পুত্রবধূ। অভাগিনী পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই বিধবা হয়। স্বামী রামরূপ, রাণী ভবানীর রাজ্যে চাকরি করিতেন, চাকরি স্থানেই কালপ্রাপ্ত হন। জনরব, রামরূপকে প্রজাবিদ্রোহে পড়িয়া খুন হইতে হইয়াছিল। আটটি প্রজা, সে পাপে দ্বীপান্তরে গিয়াছে। সুধামুখী, দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্জের মধ্যমা পুত্রবধূ। সোনার আজিও বিবাহ হয় নাই।

দারগাবাবু হরিশের এজাহার লইতে গিয়াছিলেন, হরিশ একটা কথাও কহে নাই। পাহাড়ী ত এদেশের ভাষাই বুঝে না। আজ আমি একবার হরিশের এজাহার লইব মনস্থ করিয়া তাহাকে একটু নির্জনে লইয়া গেলাম। হরিশ বলিল, 'মাথা খুঁড়িলেও আপনারা আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না। আমি জানি, আমার শাস্তি হওয়া উচিত। তবে এত যে আত্মগোপন, তাহার কারণ আত্মপ্রকাশের ভয়। নতুবা চারি চারিটা খুন একার দ্বারা কি সম্ভব হয়? আমি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া—তবে উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলাম। আপনারা কি সহসা ধরিতে পারেন?'

হরিশের মনে অনুতাপ আসিয়াছে, সুতরাং এখন সে মিথ্যা বলিবে না—'এই বিশ্বাসে সমবেদনা জানাইয়া, প্রকৃত কথা বলিতে

অনুরোধ করিলাম। হরিশ বলিল, 'বলিব। আমার আর কেহ নাই। দূর সম্পর্কে যদি কেহ থাকেন, জানি না; নিকট কেহ না। রামতনুর দেওয়ানির পর রামতারকও কিছুদিন দেওয়ানি করিয়াছিলেন। আমি সেই সময় রামতারকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম,—রামতারক খোরাক পোষাক দিতেন—তাঁহার কয়েক কার্যই আমি করিতাম, যত্ন পাইতাম। রামতারক হাতে-কলমে তেমন পোক্ত ছিলেন না, সেই জন্যই আমার আদর ছিল। মা-ঠাকুরানিও যত্নশ্রদ্ধা করিতেন। তখন বাড়ির ছেলের মতই ছিলাম। শশী তখন তের বছরের। বরের অনুসন্ধান হইতেছে, মনের মত তেমন বর মিলিতেছে না;—বিবাহে বিলম্ব হইতেছে। শশী আমাকে বড় ভালবাসিত, আমিও তদধিক বাসিতাম। দুজনে বিরলে বসিয়া অনেক কথাই কহিতাম;—দুইজনেরই অভিপ্রায়, আমাদের দুজনে বিবাহ হইলে বড় সুখের হয়। মনের বিবাহ হইয়াছিল, কেবল মন্ত্রবিবাহ মাত্র বাকী। রাম সরকার, রামতারক বাবুর পেয়ারের খানসামা ছিল, তাহাকে দিয়া আমার ইচ্ছা বাবুকে জানাইয়াছিলাম, শশীও ভাবে ভঙ্গিতে মাতাঠাকুরানিকে জানাইয়াছিল; কর্তা গৃহিনীতে কথোপকথনও হইয়াছিল, ফল হয় নাই। আমি নির্ধন, আমি স্বজনসহায়হীন, আমি ছোট বামন,—তাঁহার আশ্রিত প্রতিপালিত, আমার মুখে এত বড় কথা? কর্তা ক্রুদ্ধ হইলেন; বাসা হইতে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। প্রাণে বড় ব্যথা বাজিল; কষ্ট হইল। আশ্রয়হীনের আশ্রয় গেল, কপর্দকের ভিখারি হইলাম, বড় কষ্ট হইল; তথাপি অন্যত্র যাইতে পারিলাম না। বাসাবাড়ির সংলগ্ন প্রাচীরের পাশে, বনে বসিয়া শশীর অপেক্ষায় থাকিতাম, দেখা সাক্ষাৎ হইত; দুঃখের কষ্টের কথা হইত; কিছু কিছু নগদ

সাহায্যও পাইতাম। এমন দশমাস। চোদ্দ বছরে শান্তিপুরে শশীর বিবাহ হইল। আশায় ছাই, মাথায় বজ্রাঘাত। প্রতিজ্ঞা রহিল, কেহ কাহাকে এ জীবনে ভুলিব না।

'শশী শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সাহায্য বন্ধ হইয়াছে, আশারও আর চিহ্ন নাই; এখানে থাকিয়া তবে আর সুখ কি? যে আমার সাধে বাদ সাধিয়াছে; যাহার কঠিন পদাঘাতে আমার গঠিত-অট্টালিকা ভাঙিয়া গিয়াছে, যাহার অনুমতিতে আমাদের সুখের জীবন দুর্বিসহ হইয়াছে; তাহাকে কন্যা সুখে সুখী হইতে দিব না? আমি যেমন ভাল বাসিয়া হতাশ হইয়াছি, সে ভালবাসা আর কাহাকেও বাসিতে দিব না; তেমন ভালবাসাও কাহাকেও দিব না। রামতারকের বংশে ত কিছুতেই নহে। ইহাই জীবনের ব্রত হইল। ব্রতধারণ করিয়াই রাধানগর চলিলাম। রাধানগরের জমিদারি দেখিয়া আসিলাম। তখনও শশীর স্বামী কাছারিতে আইসে নাই।

'কিরূপে কার্যোদ্ধার করিব, সে সকল দেখিয়া শুনিয়া, কাছারি-বাড়ির অবস্থাদি জানিয়া, নাটোরে[১৫] আসিলাম। থাকিলাম এক সপ্তাহ। আহারাদি দেবসেবাতেই চলিল। সংবাদ পাইলাম, রামরূপ আসিয়াছে; তবে আর বিলম্ব কেন? সেই দিনই রওনা,—সেই রাত্রেই রাধানগরের সকলে শুনিল, নায়েব মহাশয় খুন হইয়াছেন, —জনরব রটিল, বিদ্রোহী প্রজায় খুন করিয়াছে। সেই রাত্রেই বৈদ্যনাথ[১৬] রওনা হইলাম।

'নানা দেশেই পর্যটন করিলাম। পাছে ধরা পড়ি, সেই আশঙ্কায় একখানা হাতই গোপন করিলাম। তুলা ভরা আলখেল্লার দক্ষিণ পাশের হাতটা অমনি ঝুলাইয়া রাখিলাম, দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, ডাইন হাতখানি আমার নাই। উদ্দেশ্যসিদ্ধির চিন্তা লইয়া

ঘুরিতে ঘুরিতে, শেষে পার্শ্বনাথে[২৭] উপস্থিত হইলাম। সেইখানেই প্রায় চারি বৎসর কাল কাটিল। ভৃত্যটির বাড়ি সেই পার্শ্বনাথ মন্দিরেরও প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরে—পাহাড়ের উপরে।'

'এ সব লোক পাহাড়ি;[২৮]—যেমন বিশ্বাসী, তেমনই প্রভুভক্ত। প্রভুর জন্য ইহারা প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করে। কার্যসিদ্ধির জন্য পাহাড়িকেই সহায় স্থির করিলাম। আমরা প্রথমেই নবদ্বীপে আসি। নবদ্বীপে আসিয়া তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনি জানেন। ফল কথা, রামরূপ, বিধুমুখী, সুধামুখী ও শশিমুখী, এই চারি খুনের আমিই আসামি। আমিই ভানু। বাল্যকালে ওই নামই আমার ছিল। শশী কেবল সে নাম জানিত; সেই নামেই আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। শশী, বাল্যপ্রেম কখনও ভুলে নাই; সে দেখা দিতে আসিয়াছিল, দেখা হইয়াছিল। কিন্তু আমার সহিত যাইতে গররাজি হয়—সহসা ক্রোধ হইল, তাহাকে আর ফিরিতে দিই নাই—ধর্মরাজ ভবনে পাঠাইয়া দিয়া তাহার ধর্মরক্ষা করিয়াছি। পরের সকল ঘটনা আপনি জানেন। কার্যসিদ্ধির পর—ব্রত উদ্‌যাপনের পর—আমি নিজেই আত্মহত্যা করিব স্থির করিয়াছিলাম। এখন ধরা পড়িয়াছি, যে ভাবেই হউক পাপের শাস্তি হইলেই মঙ্গল। আমার জীবনের এখন আর কিছুমাত্র মূল্য নাই।

একটু সন্দেহ হইল। রামরূপকে হরিশই খুন করিয়াছে সত্য, কিন্তু এ তিন খুন—অন্ততঃ নবদ্বীপ ও কাল্‌নায় খুন যে হরিশ স্বহস্তে করিয়াছে, এমন বোধ হইল না। বেশ মনে আছে,—চক্ষের নিশানায় বিশ্বাস জন্মিয়াছে,—পথে পথে দুই স্থানেই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে; সুতরাং বেশ ধারণা জন্মিয়াছে, কাল্‌না ও নবদ্বীপের খুন পাহাড়িই করিয়াছে। সে কথা কৌশলে জিজ্ঞাসা করিলাম। হরিশ বলিল 'সে

নির্দোষ। সে বিশ্বাস রাখিয়াছে—বিশ্বাসীর কাজ করিয়াছে—আমি বিশ্বাসঘাতক হইব কেন? —সে নির্দোষ।'

নবদ্বীপ ও কালনার পথে আমার সহিত পাহাড়ির দেখা হইয়াছে, উভয় স্থানেই খুন করিয়া আসা ভঙ্গীতেই তাহাকে আমি দেখিয়াছি, তবে সে নির্দোষ কিসে? সন্দেহভঞ্জন হইল না। নীরব রহিলাম। আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া হরিশ বলিল,—

'আর প্রশ্ন করিবেন না। আমি অস্বীকার করিলে আপনারা কিছুতেই এ সকল খুনের কিনারা করিতে পারিবেন না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই বিশ্বাস করুন।' আর প্রশ্ন করিলাম না। যে দাড়ি গাড়িবানের গাড়িতে পাইয়াছিলাম, তাহা হরিশেরই জাল দাড়ি। শিবমন্দিরের ভিতর সেই বহুরূপীর ঝাপিও পাওয়া গিয়াছিল তাহা সর্বসমক্ষে অনুসন্ধান করা গেল,—দাড়ি মিলিল না। দাড়ির মালিকও সেই খোয়া দাড়ি নিজেরই বলিয়া শনাক্ত করিলে, সে দাড়ি তবে গাড়িতে পড়িয়াছিল কেন? গাড়িবান বলিয়াছে, ভৃত্যটির বরাবরই খুব লম্বা দাড়ি ছিল, সে দেখিয়াছে—মনে আছে। আমারও বেশ মনে আছে, পাহাড়ির দাড়ি ছিল না; এদিকে প্রমাণে পাইলাম, —পাহাড়িই খুন করিয়াছে। ভৃত্য খুন করিবার অভিপ্রায়েই গাড়িবানের নিকট দাড়ি লইয়া দেখা দিয়াছিল; ভূয়া দাড়ি পরিয়া আত্মগোপন করিয়াছিল। ভৃত্য, শশিমুখীকে খুন করিতে গুপ্তিপাড়া হইতে দাড়ি পরিয়াই আসিয়াছিল, দাড়ি পরিয়াই ফিরিয়াছিল, গাড়ির ভিতর খুলিয়া রাখিয়াছিল—একধারে অতর্কিতভাবে পড়িয়াছিল; ভৃত্য ভাবিয়াছিল, পথে ফেলিয়া আসিয়াছি। সেই জন্যই ভৃত্য দাড়িঢাকা পাগ বাঁধিয়াছিল। এ সকল কতক প্রমাণে কতক অনুমানে স্থির করিলাম। খুন করিয়াছে পাহাড়ি, হরিশ নিজেই সেই দোষ আপন

স্কন্ধে লইতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম। সেই ভাল। হাকিমের সম্মুখেও হরিশ আত্মদোষ স্বীকার করিল। পাহাড়ি কেবল সহকারিতাকরণ অপরাধে অপরাধী হইল;—ফাটকে গেল। হরিশ আত্মহত্যা করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে স্থির করিয়াছিল, অন্যরূপে তাহার সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। প্রথম চাকরি,—প্রথম অনুসন্ধানে সুখ্যাতি পাইলাম, পুরস্কৃত হইলাম। উৎসাহ বৃদ্ধি হইল।

টীকা

১. **বহালী পরওয়ানা**: নিয়োগপত্র বা Appointment Letter।

২. **হুকুমনামা**: লিখিত আদেশ।

৩. **গনিব্যাগ**: Gunny-bag। চটের বস্তা বা থলে।

৪. **নবদ্বীপ**: ন-টি দ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ, সীমান্তদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মদদ্রুমদ্বীপ এবং কলদ্বীপ নিয়ে গঠিত নবদ্বীপ ছিল সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন এবং লক্ষ্মণসেনের রাজধানী (১১৫৯-১২০৬)। বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্র এই শহরকে পরবর্তী যুগে বাংলার অক্সফোর্ড আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ভাগীরথী এবং জলঙ্গী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত নবদ্বীপ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এখানেই।

৫. **হিকমতি**: দক্ষতা। এক্ষেত্রে পরিচয় গোপন করে কোনও অনুসন্ধান করা বা ছদ্মবেশে অথবা ছদ্ম-পরিচয়ে কোথাও মিশে যাওয়ার দক্ষতার কথা বলা হয়েছে।

৬. **মাঘী পূর্ণিমা**: বাংলা ক্যালেন্ডারের দশম মাস, মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথি। এই তিথিকে এক বিশেষ পবিত্র তিথি হিসেবে হিন্দুরা গণ্য করেন।

৭. **সপ্তরাত্রি নবদ্বীপ প্রবাস**: বিভিন্ন হিন্দু তীর্থস্থানে বিভিন্ন সংখ্যক দিন বা রাত্রি যাপনে বিভিন্ন পুণ্য ফল লাভের বিশ্বাস প্রচলিত আছে। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে শুরু করে বারো দিন নবদ্বীপে মেলা বসে। কীর্ত্তনীয়া এবং অন্য ধর্মসঙ্গীত-বিশারদদের জমায়েত ঘটে।

৮. **আখড়া**: আক্ষরিক অর্থে কুস্তি, দেহচর্চা, গান-বাজনা প্রভৃতি অনুশীলনের কেন্দ্র। সন্ন্যাসীদের, বিশেষত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বা বৈরাগীদের আশ্রয় বা মঠকেও আখড়া বলা হয়। বড়ো আশ্রম বা আখড়ায় সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে তীর্থযাত্রীদের বাসস্থান এবং প্রসাদরূপ খাওয়া মিলত।

৯. **দৌড়দার চালা**: পাঁচিল বরাবর একটানা চালা। যাকে ইংরেজিতে running-shed বলা যেতে পারে। যেমন, টানা বারান্দাকে বলা যেতে পারে দৌড়দার বারান্দা ।

১০. **অঙ্গরাখা**: আংরাখা। চাপকান-জাতীয় লম্বা ঝুলের জামা। সংস্কৃত 'অঙ্গরক্ষা' থেকে উদ্ভূত এই শব্দ হিন্দি ভাষায় 'অঙ্গরখা' হিসেবে প্রচলিত।

১১. **লোমশ বিনামা**: বিনামা 'জুতো'র প্রতিশব্দ। নামের হেতু জুতো শব্দটি অশোভনীয়, সেই হিসেবে। এক্ষেত্রে শীতের প্রকোপ আটকাতে লোমযুক্ত চামড়ার জুতো।

১২. **শ্রীচন্দ্রনাথ**: অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এক পর্বতশীর্ষে অবস্থিত মহাদেবের মন্দির। এটি বৌদ্ধদেরও তীর্থস্থান।

১৩. **দুনিয়া হদিশী**: অর্থ পৃথিবী পরিচয়। সুলোমন নামক কোনও লেখকের রচিত বিশ্ব-পরিচয় জাতীয় সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক হওয়া সম্ভব।

১৪. **পশুপতিনাথ**: নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু শহরের অনতিদূরে, বাগমতী নদীর তীরবর্তী মহাদেবের মন্দির। পৌরাণিক নাম মৃগস্থল। এখানকার প্যাগোডা-ধরনের স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত মন্দিরটি মৌর্য সম্রাট অশোকের কন্যা চারুমতির নির্মাণ মনে করা হয়।

১৫. **কাকজ্যোৎস্না**: পূর্ণিমা বা কাছাকাছি তিথিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চাঁদের যে আলোয় গভীর রাতে ভোর হয়েছে মনে করে কাক ডেকে উঠে, তাকে বলা হয় কাকজ্যোৎস্না।

১৬. **হাফেজের**: পারসিক কবি হাফেজ। তাঁর নানা ধরনের রচনা গজল হিসেবে গাওয়া হয়েছে। পুরো নাম খাজা সামসুদ্দিন মহম্মদ হাফেজ শিরাজি। নাম থেকেই বোঝা যায় ইনি শিরাজ শহরের মানুষ। জন্ম ১৩২৫ বা ১৩২৬ খ্রিষ্টাব্দে। মৃত্যু ১৩৮৯ বা ১৩৯০-এ।

১৭. **গজল**: ছন্দোবদ্ধ কবিতাকে গান হিসেবে বিশেষ সুরে গাওয়া হলে তাকে গজল বা ঘজল বলা হয়। গজলের বিষয়বস্তু হল প্রেম এবং বিরহ। প্রেমের বিরহ, তার বেদনা, মানসিক কষ্ট এবং একই সঙ্গে তার মাধুর্য গজল-এ ফুটিয়ে তোলা হয়। খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতকে সুফি সাধকদের গাওয়া গানে গজল জনপ্রিয় হতে শুরু করে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসাও গজলের বিষয়বস্তু হতে পারে। কখনও দেখা গিয়েছে অবৈধ প্রেম, সেই প্রেমের মিলনে পরিবর্তিত হওয়ার অসম্ভবতা প্রভৃতিও গজলের বিষয়বস্তু হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের রুমী, চতুর্দশ শতকের হাফেজ, ষোড়শ শতকের ফজুলি, হলেন বিশ্বশ্রুত গজল রচয়িতা। তা ছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের মীর্জ গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯) এবং মহম্মদ ইকবাল-ও (১৮৭৭-১৯৩৮) বহু বিখ্যাত গজল রচনা করেছেন।

১৮. **শান্তিপুর**: নদীয়া জেলায়, রানাঘাট মহকুমার অন্তর্গত, হুগলি নদীর বাম তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর। প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় দ্বাদশ শতকে। এখানকার তাঁতশিল্প বিখ্যাত। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তাঁত শিল্পীরা টাঙ্গাইল শাড়িও তৈরি করেন এখানে। নদীয়া জেলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই শহরেও বৈষ্ণব প্রভাব দৃশ্যমান। বহু মন্দির এবং মসজিদ আছে। প্রাচীনতম মসজিদটি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্মিত। নবদ্বীপের মতো শান্তিপুরও ছিল সংস্কৃত চর্চার এক বিশেষ কেন্দ্র।

১৯. **খানামসরা**: খানাতল্লাশি, Search।

২০. **খতম রিপোর্ট**: ফাইনাল রিপোর্ট। যে রিপোর্টে অনুসন্ধান বন্ধ করা হয়।

২১. **কালনা**: বর্ধমান জেলাস্থিত মিউনিসিপ্যাল শহর কালনার খ্যাতি অম্বিকা কালনা নামে। শহরের প্রধান দেবী অম্বিকার নামে শহরের নাম। দেবী অম্বিকা কালীর এক রূপ। মন্দিরময় শহরে ছড়িয়ে রয়েছে ১০৮ শিব মন্দির বা নব কৈলাস, শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, লালজী মন্দির, প্রতাপেশ্বর মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, শ্যামচাঁদ রাধারানি মন্দির, প্রভৃতি।

২২. **গুপ্তিপাড়া**: হুগলি জেলার চুচুড়া মহকুমার বলাগড় থানার অধীন গ্রাম-শহর। প্রথম বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত হয় গুপ্তিপাড়ায়। বেশ কয়েকটি পোড়ামাটির মন্দিরও আছে। চুচুড়া থেকে কালনার পথে গুপ্তিপাড়ার অবস্থান। হুগলি, বর্ধমান এবং নদীয়ার প্রায় সংযোগে অবস্থিত গুপ্তিপাড়া বিখ্যাত এখানকার বিখ্যাত মিষ্টান্ন গুপো-সন্দেশের জন্য।

২৩. **বাতাবন্দি**: চারদিক থেকে ঘিরে রাখা বা 'কর্ডন' করে রাখা।

২৪. **জালসেচা**: পুকুরের জাল দিয়ে সেঁচে যে-ভাবে মাছ ধরা হয়,

সেইভাবে তল্লাশি করা। বর্তমানে এই ধরনের অনুসন্ধান বোঝাতে 'চিরুনি-তল্লাশি' উপমা ব্যবহৃত হয়।

২৫. **নাটোর**: অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী ডিভিশনের জেলা ও জেলা সদর। নাটোর বিখ্যাত হয়ে আছে ঐতিহাসিক চরিত্র রানি ভবানী (১৭১৫-১৮০২) এবং কাল্পনিক চরিত্র বনলতা সেন-এর কারণে। ১৮৫৯-৬০ সালে নীলবিদ্রোহে সামিল হয় নাটোরের নীলচাষীরা। নাটোরের রাজবাড়ি এবং অদূরের দীঘাপতিয়া রাজবাড়ি এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রাচীনকালে নাটোর ছিল এক জলাজমি বা বিল। নাম ছিল চাইডাঙা। ১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রামজীবন রায় বিল ভরাট করে সেখানে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল, চলন বিল, নাটোর জেলায় অবস্থিত।

২৬. **বৈদ্যনাথ**: সেকালে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বৈদ্যনাথ ধামের শিবলিঙ্গ দ্বাদশ লিঙ্গের অন্যতম হিসেবে গণ্য হয়। এখানকার পার্বতী মন্দির বাহান্ন পীঠের একটি। দেবীর হৃদয় এখানে পতিত হয়েছিল। পুরাণে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে হরিতকিবন, কেতকীবন, পাবনী, হার্দবন, চম্পাপুরী, প্রভৃতি নামে। অদূরে তপোবন পাহাড়ে রাবণ মহাদেবের তপস্যা করে পাওয়া মহাদেবকে নিয়ে লঙ্কায় ফিরে যাওয়ার পথে হরিতকীবনে পৌঁছলে রাবণের প্রস্রাবের বেগ আসে। তখন ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণুর হাতে মহাদেবকে দিয়ে রাবণ প্রস্রাব করার সময়ে বিষ্ণু মহাদেবকে নামিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হন। মহাদেব বৈদ্যনাথরূপে সেখানে থেকে যান। বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দেওঘর জেলার অন্তর্গত।

২৭. **পার্শ্বনাথ**: পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ পাহাড় অধিক পরিচিত শিখরজি নামে। পর্বতশীর্ষে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মন্দির। পর্বতের উচ্চতা ৪৪৩০ ফুট। এটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের উচ্চতম বিন্দু। পর্বতশীর্ষের মন্দিরে

পৌঁছতে সাতাশ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। সমস্ত পাহাড় জুড়ে ত্রিশটিরও বেশি জৈন মন্দির আছে।

২৮. **এ সব লোক পাহাড়ি**: যাদের দেশ পূর্বতন বিহার, বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের গিরিডি জেলায়, পরেশনাথ মন্দির থেকে কুড়ি ক্রোশ দূরে, সেদিক থেকে ভাবলে, এযুগে এদের পাহাড়ি বলা যায় না।

নবীন নবেসেন্ধা

অদ্ভুত জালিয়াতি—সরকারি নথি জাল

লস্করপুরের নবকুমার দত্তের তিনশত সতের টাকা, কয়েক আনার একটা গাঁতী[১], গাংনীর গণপতিবাবু নিলাম খরিদ করেন। দত্তের গাঁতীটাই জীবিকা, গণপতিবাবুর বাঁশগাড়ির[২] সময় দত্ত বাধা দেয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, খুন জখম পর্যন্তও বাকি ছিল না। অগত্যা গণপতিবাবু নিজ খরিদ মহলে দখল পাইবার জন্য দেওয়ানি করিলেন, এক আইনের ৯ ধারার মোকর্দমাও[৩] সঙ্গে সঙ্গে রুজু হইল। দত্তও প্রাণভয়ে যথাসাধ্য লড়িতে লাগিল। সদরলা[৪] বাহাদুর পুলিশ সাহায্যে দখল পাইবার জন্য গণপতিবাবুর অনুকূলে হুকুম দিলেন। খরচার দায়ে নবকুমারের ভিটা পর্যন্ত বাঁধা পড়িল।

একদিন দলবলে থানার দারগা, আদালতের নাজির[৫] ও পেয়াদাগণ জমি মজকুরায়[৬] হাজির রহিলেন; কাঁধে লাঙল, হাতে লাঠি কৃষাণেরা লাঙল চষিতে লাগিল। নবকুমারের কাছে সংবাদ গেল, নবকুমারের জাতি ভাই আত্মীয় স্বজনেরা আসিয়া আবাদে বাধা দিল। 'দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা নহে, আইনের কথা। হাকিমের হুকুম—তা ত অমান্য হইবার নহে। তিনিই হুকুম দিয়াছেন, বাদীর প্রার্থনা গোটেহেল[৭]; আর জমিজমা প্রতিবাদীর জিম্মায় থাকে।' আদালতের সহিমোহরযুক্ত এই মর্মের রায় ফয়সালার জাবেদা নকল[৮], নবকুমার নাজিরকে দেখাইল। নাজির মাথায় হাত দিল—ভিতরে যে একটা বিষম ভ্রম ঘটিয়াছে—নাজির তাহা

এতদাভাসেই বুঝিল, অন্তরেও একটু শঙ্কিত হইল; 'হুজুরের দ্বিতীয় হুকুম না আসা পর্যন্ত জমির আবাদ তরদুদ[৯] বন্ধ থাকে' এইরূপ মৌখিক হুকুম দিয়া, নাজির মায় পেয়াদাগণ নাজিরাবাদে চলিয়া গেলেন। গণপতিবাবু দেওয়ানি আদালতে[১০] দরখাস্ত করিলেন, সর্বসমক্ষে আসল নথি আনিয়া সেরিস্তাদার[১১] হরফান্ তজদিক[১২] করিলেন, নথি খুলিয়াই হাকিম অবাক!

প্রকাশ্য আদালতে বসিয়াই হাকিম বলিলেন, 'আমার বেশ মনে আছে, গণপতিবাবুকেই আমি ডিক্রি[১৩] দিয়াছি; কিন্তু নথিতে এ কি দেখি।'

হাকিমের মুখের কথা থামিতে না থামিতেই আদালতময় রাষ্ট্র—ভীষণ জালিয়াতি—গোটা নথিটাই জাল! আদালতের সকলেই তটস্থ। এ ভীষণ কলঙ্কভার কাহার মাথায় পড়িবে, কে জন্মের মত জিঞ্জিরি[১৪] যাইবে, এই ভাবিয়া সকলেই আকুল।

ঠিক হাকিমের স্বহস্তের যেমন অক্ষর ঠিক সেই অক্ষরে, তিনি যে ভাবে শেকস্ত[১৫] ফার্সি লেখেন, ঠিক সেইরূপ এবারৎ দোরস্ত[১৬] বিপরীত উক্তি! হাকিমও ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। লেখা সহি, আদালতের মোহর, এ সকল দেখিয়া তিনি এ নথি জাল বলিতে সাহসই করিলেন না। ঘটনা আনুপূর্বিক সুপ্রিমকোর্টে লিখিয়া পাঠাইলেন।

কেহই যখন এ নথি জাল বলিতে সাহসী হইল না তখন নথি নাকচ্ করাই বা যায় কোন্ কানুন বলে? নথি জাল বলিলেই, সে জাল নথির জালিয়াত লেখককে ধরিতে হয়; নবকুমারের প্রতিকূলে তেমন একটি সাক্ষীসাবুদও মিলিল না। আইনানুসারে ঠিক এ অবস্থায় পুনর্বিচারও হয় না। অনুপায় ভাবিয়া সুপ্রিমকোর্ট আদেশ দিলেন, বাদী

নিম্ন আদালতে রায়ের ছানি[১৭] প্রার্থনা করিলে, তজবিজ[১৮] ছানি বিচার হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু ঘটনায় অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সদরওয়ালার নিজের বিশ্বাস, তিনি গণপতিকে ডিক্রি দিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাসও তাহাই; সে বিশ্বাসবাক্যে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগণের অনাস্থা জন্মিল না; পূর্বোক্ত ঘটনা আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ করিয়া গোয়েন্দা-পুলিশের উপর অনুসন্ধানের ভার দিলেন।

আমাদের তিনজনের উপর অনুসন্ধানের ভার পড়িল। তিনজনে তিন দিকে তিন প্রকার উপায় স্থির করিয়া যাত্রা করিলাম। আমি গেলাম প্রথমে নাজিরাবাদে। সেরিস্তাদারকে পরিচয় দিয়া নথিটি লইয়া দেখিলাম; তেমন কিছু পাইলাম না। নথি যদি জাল হয়, সেরিস্তার যোগে ঘটিয়াছে; সেরিস্তাদারও সুতরাং এ ঘটনায় লিপ্ত। সে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া, লস্করপুরে গেলাম। বড় গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস; গ্রামখানি দামোদরের তীরেই অবস্থিত। নদীর ধারে বাজার, বন্দর, সেখানে নিত্য নিত্য হাটবাজার বসে; বাজারেই বাসা লইলাম। সে দিন তথায় থাকিয়া নবকুমারের অবস্থার পরিচয় লইলাম। দরিদ্র লোক। ওই জমিটি মাত্রই জীবিকা। তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ নবকুমার সর্বদা বাড়ি থাকে না; চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে এক জমিদার সরকারে তহশিলদারি কার্য করে; বেতন পাঁচ টাকা। মধ্যম রামকুমার চির রোগী, বাড়িতেই থাকে; বাড়ির কর্তৃত্ব করে। কনিষ্ঠ প্রাণকুমার এখনও দাদার বাসায় থাকিয়া তালেব-ইলমি[১৯]—লেখাপড়া শিখিতেছে। সন্ধ্যা হইয়াছে, কুলঙ্গিতে একটি মাটির প্রদীপ টিপি টিপি জ্বলিতেছে, তিন চারি জন লোক নবকুমারের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছে। একপাশে রামকুমার

একখানা জলচৌকিতে বসিয়া কাশিতেছে। সন্ধ্যার পর হইতেই তাহার হাঁপের বৃদ্ধি হয়।

রাধানগর থানার দুইজন কনষ্টেবল আমার সাহায্যার্থ আসিয়াছে, সঙ্গেই আছে। চণ্ডীমণ্ডপের বাম ধারেই একটা বাগান; সেই বাগানের ভিতর তিন জনে লুকাইয়া রহিলাম। মণ্ডপ ক্রমে নির্জন হইল, সঙ্গীদের শিক্ষা দিয়া—সেই বাগানেই থাকিতে বলিয়া, চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলাম; দ্রুতগতি মণ্ডপে উঠিতেই রামকুমার তটস্থ হইল, পরিচয় চাহিল। বলিলাম, 'বিপদ আসন্ন। তোমাদের জালিয়াতি ধরা পড়িয়াছে। যে জাল নথি তোমরা আদালতে দাখিল করিয়া গণপতির খরিদা সম্পত্তি ঠকাইয়া লইতেছ, সে নথি জাল বলিয়া স্থির হইয়াছে। থানার দারগা একশত পেয়াদা চৌকিদার লইয়া তোমাকে গেরেপ্তার করিতে আসিতেছেন। হুকুম, তোমাকে জিঞ্জিরী যাইতে হইবে। এখনও উপায় আছে। সেই জন্যই আসিয়াছি। যে হাতে-কলমে ওই নথি জাল করিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া দিলে কোম্পানি বাহাদুর হাজার টাকা বক্‌শিশ দিবেন। তুমি যদি তাহার নাম ঠিকানা বল, তোমাকে আমি বাঁচাইতে পারি। পুরস্কার লইয়াই আমার কথা। আসল জালিয়াত পাইলে কে আর নকল চায়? তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে আমারও লাভ, তোমারও মুক্তি! আমিও দারগা, তোমাকে আমি কোম্পানির তরফে সাক্ষী করিয়া লইব। কেমন রাজি আছ?'

রামকুমার নীরব, কাঁপিয়াই অস্থির, কথা কহিবার শক্তি পর্যন্ত নাই! হাঁপের টান আরও বাড়িয়া গিয়াছে, রামকুমার মরণাপন্ন! আমি আবার বলিলাম, 'স্বীকার করিতেছি, তোমাকে আমি সরকারি সাক্ষী করিয়া লইব। সেই লোকটাকে শাস্তি দেওয়াইতে পারিলেই

হাজার টাকা পুরস্কার পাইব। তোমার কি ক্ষতি? যদি সম্মত না হও, আমি তোমাকেই গেরেপ্তার করিব, আমিও সঙ্গে পদাতিক আনিয়াছি।' তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত করিলাম। ইঙ্গিতমাত্র দুইজন পুলিশের পোষাকপরা সশস্ত্র প্রহরী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কম্পিতকণ্ঠে ভীত রামকুমার বলিল, 'আমাকে রক্ষা করুন। সে নবীন নবেসেন্ধা[২০]—নিবাস মায়াপুর।'

রামকুমার মড় মড় হইল, অভয় দিয়া তৎক্ষণাৎ লস্করপুর ত্যাগ করিলাম। নবকুমারের বাড়ি বাতাবন্দি রহিল। থানায় আসিয়া সে সকল বন্দোবস্ত করিতে অনেক রাত্রি হইল, সে রাত্রি সুতরাং থানাতেই যাপন করিতে হইল।

মায়াপুর রাধানগর হইতে তিন ক্রোশ মাত্র পশ্চিমে। পরদিন বৈকালে মায়াপুরে চলিলাম, একাকী। নবীন নবেসেন্ধা, গ্রামের একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। মেটে বাড়ি, কিন্তু তিন মহল। তা ছাড়া কাছারি বাড়ি, বাগান বাড়ি আছে,—চাষবাস, গাঁতিজমা, নবীন একজন বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি। সদর দরজায় দাঁড়াইলাম, আতিথ্য স্বীকার করিতে চাহিলাম; নবীনের চাকরেরা হাঁকাইয়া দিল। অগত্যা দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। রাত আটটা। ঝাড়া দুইঘণ্টা কাল দরজায় দাঁড়াইয়া আছি, কত লোক যাইতেছে আসিতেছে, কেহই আমার সহিত কথা কহে না; আড়ে আড়ে চায়, আর চলিয়া যায়। আমি দাঁড়াইয়াই আছি। আরও একঘণ্টা পরে, রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় স্বয়ং নবীন নবেসেন্ধা, গোলাবাড়ি হইতে বাসাবাড়িতে আসিলেন, বেশ বাবাজিয়ানা চেহারা। গলায় মালা, উপর হাতে ইষ্টকবচ, পায়ে খড়ম, হাতে গাড়ু।

গড় হইয়া প্রণাম করিলাম। বিদেশবিভূমে আসিয়াছি, দয়া করিয়া

রাত্রে একটু স্থান দিলে রক্ষা পাই; নবেসেন্ধা মহাশয়কে এ প্রার্থনা জানাইলাম, সম্মতি হইল না। অতি কর্কশকণ্ঠে নবেসেন্ধা অন্যত্র যাইতে বলিলেন, আমি নাছোড়। একপ্রহর বাক্‌চাতুরীর পর সম্মতি পাইলাম। থাকিলাম, দরজার পাশে এক গোহাল ঘরে। গুড় চিড়া উপচারে রাত্রির ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া উপায় চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ গোহাল ঘরে চাবি পড়িল। একটা লোক দুই তিনবার 'ওগো অতিত মশয়' বলিয়া ডাকিল, উত্তর না দিতেই গোশালার দরজায় চাবি দিল! যা একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, ঘুচিল। বেড়ার ঘর বেড়ার ফাঁক দিয়া দরজার দিকে নজর দিয়া রহিলাম। দেখিলাম, খুব ধীরে ধীরে বিশেষ সতর্কভাবে নবীন স্বয়ং বাহির হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন চারিটি লোক। খুব সতর্কতার সহিত সদর দরজা খুলিয়া সকলেই বাহির হইল! এত হুঁসিয়ারি—এমন গমনভঙ্গি দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইল, ইহাদের মনে কুঅভিসন্ধি আছে।

সমস্ত রাত্রিই জাগিয়া বসিয়া আছি। শীতল বাতাস বহিতেছে, নীরব ধরণীর একটু যেন সচেতন ভাব আভাসে প্রকাশ পাইয়াছে; প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। হঠাৎ দরজায় শব্দ; চাহিয়া দেখি, নবেসেন্ধা আসিয়াছেন। নবেসেন্ধা তবে লোকজন লইয়া এত রাত্রে কোথায় গিয়াছিল? চিন্তা করিতে করিতেই রজনী প্রভাত।

নবেসেন্ধা আসিতেই গোহালের চাবি সেই চাকর লোকটি খুলিয়া দিয়া গিয়াছিল, একবার ডাকিয়াছিল কথা কহি নাই। আবার ডাকিল; তখন আমি মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছি। লোকটি মহা ডাকাডাকি আরম্ভ করিল, ভাবে ভঙ্গিতে গালি দিতে লাগিল, শীঘ্র না উঠিলে মারিয়া তাড়াইবে বলিয়া শাসন করিতে লাগিল; কে কথা কহে? দারুণ শূলবেদনা, সেই বেদনাতেই আমি অস্থির; চাকরের

কথার কে উত্তর দেয়? শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ—যন্ত্রণায় প্রাণ যায়, দেখিয়া শুনিয়া চাকর চলিয়া গেল!

কতক্ষণ পরে নবীন আসিল, অতিকষ্টে আসল কথাটা বুঝাইয়া বলিলাম। আমার উত্থানশক্তি-রহিত। শূলবেদনায় আমি মারা যাই। আহার এখন তিনদিন করিব না। কেবল পড়িয়া থাকা। বৈকালে যদি বেদনাটা একটু নরম পড়ে, উঠিয়া অন্যত্র যাইব। একটু নরম না পড়িলে—উঠিবার তাকত হইবে না। অগত্যা সম্মতি হইল, গোহাল ঘরেই পড়িয়া রহিলাম।

আমার দিকে এখন আর তত লক্ষ নাই। দরজাটি বন্ধ করিয়া, খুব সতর্কতার সহিত ছিটেবেড়ার বাঁশ খুলিতে লাগিলাম। এক কোণে একখানা খড়কাটা ভোঁতা বঁটি পড়িয়াছিল, তাহার সাহায্যে বেড়ার বাঁধন কাটিয়া, একটি লোক যাহাতে অনায়াসে বাহির হইতে পারে, সে পথ করিয়া রাখিলাম। বৈকালে আবার সেই প্রকার তর্জন গর্জন। একগুণ তর্জন গর্জন, তাহার চতুর্গুণ ছট্‌ফটানি—যন্ত্রণার কাতরানি। চাকরটি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল সন্ধ্যাও হইল। সমস্ত দিন একবিন্দু জলও পেটে পড়ে নাই। কেহ বলেও নাই। নির্জলা উপবাসে দিনটি এক রকম কাটিয়া গেল।

নিয়মিত সময়ে,—সে সময় রাত্রি দেড় প্রহরের পর,—সেই দেড় প্রহর রাত্রির পরে নবেসেন্ধা ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইল, সঙ্গের তিন চারিটি লোক আজও সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল। আমিও নিঃশব্দে সেই ছিটেবেড়া ফাঁক করিয়া বাহির হইলাম। প্রাচীর টপ্‌কাইয়া সদর রাস্তায় পড়িলাম। খুব দূরে থাকিয়া নবেসেন্ধার পাছু লইলাম।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে নবেসেন্ধার বাগানবাড়ি। প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, বাগানের মধ্যে একখানি আটচালা ঘর। দরজায় একটি

লোক—সে প্রহরী। বাগানের চারিধারে ঘন কাঁটার বেড়া। মানুষ কি কথা, মাছিটিও অক্ষত দেহে প্রবেশ করিতে পারে না! তবে এখন করি কি? থানায় এখন খবর দেওয়া চলে না। নবেসেন্ধা এই বাগানে প্রবেশ করিয়াছে, নিত্য নিত্যই প্রবেশ করে; কিন্তু কি জন্য? বাগানে আসিয়া জালজুয়াচুরিও করিতে পারে, সাধনভজনও ত করিতে পারে? চাক্ষুষ না দেখিয়া কি প্রকারে সংবাদ দিব? উদ্যান প্রবেশের পথানুসন্ধান করিতে লাগিলাম। বাগানটা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম, চারিদিকেই বেড়া। উত্তরদিকের একটি নারিকেল গাছের মাথা, বেড়ার উপরে আসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, গাছটি ঝড়ে পড়া। একটা ছোট ঝোপের উপর খুব সাবধানে উঠিয়া, সেই নারিকেলের একটা লম্বিত বাল্‌দেয়[১] ভর করিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া অতি কষ্টে বাগানে প্রবেশ করিলাম। পা টিপিয়া টিপিয়া আটচালার নিকট আসিলাম। দরজা জানালা ভিতর হইতে বন্ধ, তবে ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছে; ধীরে ধীরে একটা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম! ভিতরের লোক যে চেতন—কোনও কার্য করিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতেছি, তবে কার্যকারীরা নীরব। অনেকক্ষণ পরে নবেসেন্ধার আওয়াজ পাইলাম। একটু কড়াসুরে বলিল, 'ছাই হইয়াছে—তোমার মাথা হইয়াছে; প, ব, ন, জ, এ সকল কিছুই হয় নাই—আসলের সঙ্গে আদৌ মিলে নাই। সব বাতিল।' হাঁ, ভিতরে জাল চলিতেছে।

একটু অন্যমনস্ক হইয়া দেখিতেছি, সহসা দরজা খুলিয়া গেল; আটচালা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম,—দ্রুতপদে বাগানের অন্ধকারে লুকাইয়া পড়িলাম, লোকটি তথাপি ছাড়িল না, দ্রুতপদে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল; সে ত স্বয়ং নবেসেন্ধা! আমিও মরণ বাঁচন তুল্য জ্ঞান করিয়া, নবেসেন্ধাকে জড়াইয়া ধরিলাম। দুইজনে নিঃশব্দে

ধস্তাধস্তি হইতে লাগিল। নবেসেন্ধা টানিয়া টানিয়া আমাকে একটা ধারের দিকে লইয়া চলিল। আটচালায় না লইয়া গিয়া বাগানের ধারের দিকে লইয়া যাইতে চায় কেন,—দেখিবারও কৌতূহল হইল; একটু সহল দিলাম। দেখি ইঁদারা! নবেসেন্ধা আমাকে ইঁদারায় ফেলিয়া দিতে চায়। ভয় হইল। তৃষ্ণায় শুষ্ক বুক আরও শুকাইল,—প্রাণপণে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলাম। একটু সুবিধা বুঝিয়া প্রাণপণে একটা ধাক্কা দিলাম; যৌবনের বল, বয়স্ক নবেসেন্ধার বলকে হটাইয়া দিল। টাল খাইয়া নবেসেন্ধা ইঁদারায় পড়িয়া গেল! পুরাতন ইঁদারা, উঠিবার পথ নাই। বুঝিলাম, পথ থাকিলে নবেসেন্ধা তখনই উঠিত, সঙ্গিদের ডাকিয়া ধরপাকড় করিত। সে আশায় ছাই।

যে পথে ঢুকিয়াছি সেই পথে বাহির হইয়া রুদ্ধশ্বাসে থানার দিকে ছুটিলাম। পৌঁছিলাম রাত তৃতীয় প্রহরে। তখনি পুলিশ পদাতিক ও দারগাবাবুকে লইয়া রওনা।

নবেসেন্ধা তখনও ইঁদারায়। দড়া নামাইয়া নবেসেন্ধাকে তোলা হইল, লোকটা কাঁপিতেছে। সারা রাত্রি এঁদো ইঁদারার পচা জলে পড়িয়া থাকিয়া, লোকটা যায় যায় হইয়াছে। সেঁক তাপের বন্দোবস্ত করিতে হইল।

আটচালা অনুসন্ধান করা হইল, সাজসরঞ্জাম কিছুমাত্র পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল, খান সাত আট আসন, তিনচারি প্রস্ত পূজার বাসন, মালা টাট ইত্যাদি। নবেসেন্ধা বলিল, 'আমরা রাত্রিতে এই নির্জনে বসিয়া সাধন ভজন করি। কাল রাতেও আসিয়াছিলাম। (আমাকে দেখাইয়া বলিল) এই বাবুকে চোর বিবেচনায় ধরিয়াছিলাম; বলে পারি নাই, আমাকে ইঁদারায় ফেলিয়া দিয়া ইনি পালাইয়া ছিলেন।' বড় চিন্তিত হইলাম।

নবেসেন্ধা বলিয়াছে, 'আমরা সাধন ভজন করি,' কিন্তু আর কাহারও নাম করে নাই। একা-ত 'আমরা' হয় না; আর কে কে ছিল, কবুল করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল। গ্রামের অনেকেই সেই বাগানে আসিয়া জুটিলেন।

আটচালার পাশে একটা গুয়াগাছের গোড়ায় কতকগুলি বাজে কাগজ পড়িয়াছিল, সে কাগজে কেবল ব, ম, য, স, ল, ইত্যাদি বর্ণমালা লেখা; প্রমাণ এই পর্যন্ত। ইহা ত যথেষ্ট নয়!—পীড়নের মাত্রা বাড়াইতে হইল, দুইজন গ্রামীক লোকের নামও মিলিল।

তাহার একজনের নামে, নবেসেন্ধাকে দিয়া বলপূর্বক একখানা রোকা[২২] লেখাইয়া লইলাম। রোকায় লেখাইলাম, 'আমি ধরা পড়িয়াছি! যন্ত্রগুলি যদি পুলিশের হাতে পড়ে, সকলেরই প্রাণ যাইবে। আমি এখন বাড়িতে পুলিশের হেপাজতে আছি। বাগান-বাড়িতে আর কেহ নাই। বড়ই বিপদ! পত্র-বাহক বিশ্বাসী লোক, অবিলম্বে যাহা কিছু যন্ত্রাদি যেখানে আছে, গোপনে এই লোকের হাতে দিবা। কিছুমাত্র বিলম্ব কি অবিশ্বাস করিবে না। আরকি লিখিব।'

দুইজন কর্মিষ্ঠ পদাতিককে, আটচালার দুই পাশের দুইটি নারিকেল গাছে উঠিয়া, গোপনে আটচালার দিকে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়া, আসামি লইয়া তাহার বাড়িতে আসিলাম। যে চাকরটা আমাকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সে ত অবাক্। দারগাবাবুকে এদিকের কার্যে নিযুক্ত করিয়া, আমি সেই রোকা লইয়া বাহির হইলাম। এপাড়া ওপাড়া, শীঘ্রই যথাস্থানে পৌঁছিলাম। পত্র পড়িয়া লোকটা বড় কাহিল হইয়া পড়িল। ঘন ঘন আমার মুখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। বলিলাম, 'আর চাও কি? বাঁচিতে চাও ত শীঘ্র রোকার লিখিত মত কাজ কর। আমি নবীনের

মামা। অবিশ্বাস করিলে নিজেও ঠকিবা, নবীনেরও সর্বনাশ করিবা। তাহাকে ত বাঁচান চাই।'

লোকটি অস্বীকার করিল। বলিল, 'সে কি কথা! আমি এর কি জানি? গরীব কায়স্থের সন্তান, আমি কষ্টে দিনপাত করি, আমি জালজুয়াচুরির কি ধার ধারি?'

অনেক বুঝাইলাম,—কায়স্থ সন্তান রাজি হইল না। রোকায় গোল আছে! হয় ত নবীন নিজের হস্তাক্ষরে এ রোকা লেখে নাই। যাহা হউক, এ কৌশলে কিন্তু ফল ফলাইতে পারিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। নবীন এতক্ষণ বড় ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, আমাকে হতাশ হইয়া ফিরিতে দেখিয়া, প্রফুল্ল মুখে বলিল, 'বলিয়াছি ত মশায়, আমি এ সকলের কিছু জানি না। অভাব কি আমার? জালিয়াতি ব্যবসায়ে লোক আঁটকুড়ো[২৩] হয়, মহাব্যাধিগ্রস্ত হয় পরকাল খোয়ায়! তেমন কাজ আমি কি দুঃখে করিব?' সকল শ্রমই পণ্ড! যেমন আশা, তাহার শতগুণে হতাশ হইতে হইল!

আসামি আর আটক রাখিতে সাহস হইল না। মনে মনে বেশ জানি, কিন্তু প্রমাণ পাইলাম না। করি কি! সেইদিন হ'তেই একজন পদাতিক মাত্র লইয়া, প্রতিরাত্রে সেই নারিকেল গাছে উঠিয়া পাহারা দিতে লাগিলাম। শেষরাত্রে নামিয়া থানায় যাই, আবার সন্ধ্যারাত্রে আসিয়া বাগানে ঢুকি। নিত্য নিত্য ছয় ক্রোশ পথ হাঁটা; এমন প্রায় দেড়মাস। বাগানে আর জনমানবের গতিবিধি নাই; কেবল দরজার পাশের একখানা চালায় এক বৃদ্ধ মালি থাকে মাত্র!

একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, ধীরপদে নবীন বাগানে প্রবেশ করিল। সঙ্গে একটি লোক। লোকটিকে আটচালার দরজায় রাখিয়া, নবীন বাগানের দক্ষিণদিকে চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে, একটা কাঠের

বাক্স লইয়া আসিল, দুই জনেই আটচালায় ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমরাও নামিলাম। দুইজন আছি, সাহস আছে, আবার আটচালার জানালায় গিয়া দাঁড়াইলাম। নবীন বলিতেছে, 'সেবার বড় বাঁচিয়া গিয়াছি। রসিক বোস লোকটা খুব চালাক, আমার অন্যরকম লেখা দেখিয়াই সে ব্যাপারটা বেশ সামলাইয়া লইয়াছিল; আমি সেই হইতে এসব কাজ একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। তবে তোমার একটা মাত্র সই, বিশেষ পুরাতন পরিচয়, কাজেই আবার আমাকে হাত দিতে হইল। পাঁচ'শই আমি এবার লইলাম, কিন্তু ফল হইলে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।' আগন্তুক সম্মতি জানাইল, আমরা একপাশ হইতেই লোকটা চলিয়া গেল। নবীন সেই বাক্সটি লইয়া আবার সেই বাগানের দক্ষিণ দিকে চলিল, এবার পিছু লইলাম। অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইলাম না; তবে বুঝিলাম, মাটির নীচে বাক্সটা গাড়িতেছে। এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। খুব সতর্কতার সহিত নবেসেন্ধার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। পশ্চাৎ হইতে মুখে কাপড় দিয়া নবেসেন্ধাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, পদাতিকের সাহায্যে বেশ করিয়া মুখ বাঁধিলাম। গাড়া বাক্স উঠাইয়া, তাহা নবীনের মাথায় দিয়া থানার দিকে রওনা হইলাম। বৃদ্ধ মালি তখন ঘুমাইয়াছিল। মাঠের পথে চলিলাম; কি জানি গ্রামে নবীনের প্রতিপত্তি আছে; আমরা মাত্র দুজন—ছিনাইয়া লওয়ারই বা আটক কি?

সকলেই থানায় পৌঁছিলাম। সর্বাগ্রে বাক্সে কি আছে, তাহাই দেখা চাই। নবীনের নিকট চাবি ছিল, তাহাকে দিয়াই খোলান গেল। বাক্সে আছে, এক তাড়া কলম, তিন চারিখানি ছোট বড় ছুরি, দুইখানা কাঁচি, সাত আট রকমের কালির দোয়াত, একটা শিশিতে জাফ্রান গোলা, খানিকটা গন্ধক, বালির পুঁটুলি, চা-খড়ি, দাগকাটা

রুল। বাক্সটির উপরকার তাকে ও গেবে গেবে[২৪] এই সকল জিনিস পাওয়া গেল। নীচে কয়েকটি কাগজের তাড়া। সে সব তাড়ায় নানা রকম কাগজ, দাখিলা,[২৫] রসিদ, পাট্টা,[২৬] কবুলতি,[২৭] হুকুমনামা[২৮] প্রভৃতি আছে। একটা তাড়া খুলিতেই মনোরথ সিদ্ধ হইল। সেই গণপতিবাবুর মামলার আসল নথি মিলিল। নাজিরাবাদের সদরালা প্রথম যে রায় দিয়াছিলেন, যে রায়ে নবকুমার দত্ত গাঁতিচ্যুত ও খরচার দায়ী হইয়াছিল, সেই আসল নথি মিলিল। আর যায় কোথা? সেই দিনই চালান।

নবীনের সঙ্গী ছিল, জানি, দেখিয়াছি, নবীন কিন্তু এক প্রাণীর নাম করিল না। যে কায়স্থ-সন্তান দুটির নাম করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেও তেমন কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা গেল না, গতিকে নবীনই একা বিচারার্থ প্রেরিত হইল।

আসল নথি মিলিয়াছে শুনিয়া, গণপতিবাবু আসিয়া দেখা করিলেন; যথেষ্ট সুখ্যাতি—শেষে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন। এদিকে নবকুমারও জাল দলিল ব্যবহার ও জালকরণে সহায়তা প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত হইল। নবীনের হইল দ্বীপান্তর। নবকুমারের গাঁতি গেল, মকর্দমায় যথাসর্বস্ব ব্যয় হইল, শেষে তিন বৎসর কারাদণ্ড!

যে সকল আসল কাগজ দৃষ্টে নবীন জাল করিত, সেগুলি সে যত্নপূর্বক রাখিত। সেইসব আসল দলিল প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়াও জালুড়িদিগের নিকট—যাহারা জাল করাইত তাহাদের নিকট—টাকা আদায় করিত। সে সকল আসল দলিল এখন আমার হাতে। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, উপরের কর্মচারীর নিকট ফিরিস্তি দিয়া তাহা নিকটে রাখিলাম। যাহা হউক, এত মেহনত সার্থক হইল।

টীকা

১. **গাঁতি**: সামান্য জমিজমা; স্বল্প আবাদি জমি।

২. **বাঁশগাড়ি**: সম্ভবত উক্ত গাঁতি থেকে ফসল উত্তোলন, ফল আহরণ বা বাঁশ কাটার কথা বলা হয়েছে।

৩. **এক আইনের ৯ ধারার মোকর্দমা**: ফৌজদারি বা অপরাধ সংক্রান্ত নালিশের ভিত্তিতে রুজু হওয়া মোকর্দমা। ভারতবর্ষে দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইন প্রণয়নের সূত্রপাত ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে। যখন ইংল্যাণ্ডের রানি এলিজাবেথ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এক সনদ মারফত ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ কিছু অংশে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার সঙ্গে আইন প্রণয়ন ও বলবৎ করার অধিকার দেন। একই অধিকার কোম্পানিকে দেওয়া হয় ১৬০৯-এ রাজা প্রথম জেমস এবং ১৬৬১ সালে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের চার্টার বা সনদে। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দের সনদে কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হয় এদেশের আদালত গঠন এবং পরিচালনা করতে হবে ইংল্যাণ্ডের আদালতের অনুসরণে। সেই মতো ১৬৭২-এ কোর্ট অব জুডিকেচার স্থাপিত হয়। ১৭৭২-এ ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে প্রতিটি জেলায় ক্রিমিনাল কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত স্থাপন করা হয়। এই আদালতে বিচার করত দেশীয় কাজী বা মুফতিরা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে আবার হিন্দু এবং মুসলমান অপরাধীদের জন্য আলাদা আইন এবং আদালতের ব্যবস্থা ছিল।
রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৭৭৩ মোতাবেক ফৌজদারি আইন এবং বিচারের নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। গর্ভনর জেনারেল ও তাঁর অধস্তন চার কাউন্সিলর নিযুক্ত করে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।
নানাবিধ খুচরো অপরাধের বিচারের জন্য সদর আমিন এবং মুখ্য সদর আমিন এবং মুন্সেফ নিয়োগ চালু হয় ১৭৯৩-এর আইন অনুসারে। বড়ো ধরনের অপরাধের বিচার করতেন ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁকে সাহায্য

করতেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং সহকারী বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা। ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরে ছিলেন সেসনস বা দায়রা জজ। তাঁদের ক্ষমতা ছিল মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দেওয়ার। অবশ্য এই ধরনের সাজা নিজামত আদালতের সমর্থন নিয়ে প্রদান করতে হত। ১৮৩৩ সালের সনদ অনুসারে ভারতের প্রথম ল'কমিশন গঠিত হয়। এর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন লর্ড ম্যাকুলে। টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকুলে (১৮০০-১৮৫৯) এবং তাঁর তিন সহকারী কমিশনার ম্যাকলিয়ড, অ্যাণ্ডারসন এবং মিলেট ইংল্যাণ্ডের আইন, তৎকালে ভারতে প্রচলিত আইনের সঙ্গে ১৮০৪-এ ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন প্রণীত নেপোলিয়ন কোড এবং প্রায় একই সময়ে, আনুমানিক ১৮০৮ সালে, আমেরিকার লুইয়ানা রাজ্যে প্রণীত লুইয়ানা সিভিল কোড ডাইজেস্ট-এর ভিত্তিতে প্রণয়ন করা জাতি-ধর্ম, নির্বিশেষে সারা দেশে সমান ভাবে প্রযোজ্য হওয়ার জন্য প্রস্তাবিত ভারতীয় দণ্ডবিধির খসড়া প্রস্তুত করে ১৮৩৭-এর ১৪ অক্টোবর গভর্নর জেনারেলের কাছে জমা দেন। কিন্তু লর্ড ম্যাকুলের নেতৃত্বে প্রণীত খসড়া আইন আইনসভা বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পাশ হয় ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে।

৪. **সদরলা**: নিম্নতম অপরাধ সংক্রান্ত বিচারক। সদরের বিচারকের সহায়ক বা সাবজজ।

৫. **নাজির**: আদালতের উচ্চপদস্থ কেরানি বা প্রধান করণিক।

৬. **মজকুরা**: লিখিত বিবরণ। এক্ষেত্রে, যে-জমির বিবরণ লেখা হয়েছে, সেই জমিতে হাজির হলেন।

৭. **গোটেহেল**: 'গো টু হেল'। অর্থাৎ প্রার্থনা খারিজ বা ডিসমিস।

৮. **জাবেদা নকল**: প্রত্যায়িত নকল। সার্টিফায়েড কপি।

৯. **তরদুদ**: বাধা দেওয়া বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

১০. **দেওয়ানি আদালত**: সিভিল কোর্ট। যে আদালতে অপরাধ সংক্রান্ত মামলা ছাড়া অন্য দাবি দাওয়া বিষয়ক নালিশের শুনানি হয়।

১১. **সেরিস্তাদার**: কোনও দপ্তর, কার্যালয় বা অফিসের প্রধান করণিক।

১২. **হরফান তজদিক**: লেখা পরিবর্তন বা দুটি লেখা মিলিয়ে দেখা।

১৩. **ডিক্রি**: আদালতের হুকুম বা নির্দেশ।

১৪. **জিঞ্জিরি**: কয়েদখানা। জিঞ্জির শব্দের অর্থ শিকল। সেই থেকে উৎপত্তি।

১৫. **শেকস্ত**: সংক্ষিপ্ত বা নাতিদীর্ঘ।

১৬. **এবারৎ দোরস্ত**: দলিল বা হুণ্ডি লেখার উপযুক্ত ভাষা এবং লেখন।

১৭. **ছানি**: পুনর্বিচার। একই বিষয়ে দ্বিতীয়বার শুনানি এবং রায়দান।

১৮. **তজবিজ**: বিবেচনাপ্রসূত। খোঁজখবর বা অনুসন্ধান।

১৯. **তালেব-ইলমি**: মাদ্রাসার পঠন বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতার খেতাব।

২০. **নবেসেন্ধা**: কেরানি। লিপিকর। কলমচি। নকলনবীশ।

২১. **বালদেয়**: তাল, নারকেল, সুপারি বা ওই জাতীয় গাছের বৃন্তসহ পাতা। দেশি উচ্চারণে 'বালদো'।

২২. **রোকা**: রশিদ বা ঘোষণাপত্র।

২৩. **আঁটকুড়ো**: নিঃসন্তান বা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

২৪. **গেবে গেবে**: গৃহের আনাচে-কানাচে।

২৫. **দাখিলা**: ভাড়া বা খাজনার রশিদ।

২৬. **পাট্টা**: জমিদার কর্তৃক প্রজাকে বিলি করা জমির দলিল। যে নথি বা দলিলের ভিত্তিতে প্রজা জমি দখলপ্রাপ্ত হন।

২৭. **কবুলতি**: প্রজা কর্তৃক সম্পাদিত, জমির লিজপত্র, জমিদারের কাছ থেকে পাট্টার ভিত্তিতে পাওয়া জমি প্রজা যখন অন্য কাউকে লিজ দেয়, তখন প্রজাকে যে দলিল সম্পাদন করতে হয়, তাই হল কবুলতি।

২৮. **হুকুমনামা**: আদেশের লিখিত নথি। লিখিত আদেশ।

রায় মহাশয়

ভীষণ ষড়যন্ত্র—দলাদলির কাণ্ড

'—জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের জমিদার রামতারণ বাবুর বিধবা ভগ্নী সৌদামিনী গর্ভপাত করিয়াছে—রামতারণ বাবু স্বয়ং বিশ্বাসী ভৃত্য শ্রীদাম ঘোষকে সঙ্গে লইয়া সেই সাতমেসে গর্ভভ্রূণ অন্দরের পুকুরপাড়ে তেঁতুলতলায় গাড়িয়া ফেলিয়াছেন। দুইজন জেলে, বাবুর হুকুমমত অন্দরপুকুরে খাবার মাছ ধরিতে গিয়াছিল, সৌদামিনী তখন স্নান করিতেছিল; জেলেরা সৌদামিনীকে পূর্ণগর্ভা দেখিয়াছে। কাওরা হরিশের স্ত্রী, বাবুর বাড়ির বাঁধা ধাই; প্রকাশের ভয়ে তাহাকে না ডাকিয়া, তারাপুরের রূপচাঁদ হাড়ির স্ত্রীকে আনিয়া সূতিকাকার্য করিয়াছে। প্রসব হইবার পর ছেলেটি একবার কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। দ্বারিক চৌকিদার সেই সময় বাবুর বাড়ির অন্দরের দিকে চৌকি দিতে গিয়াছিল, সে কান্নার শব্দ পাইয়াছিল। পুলিশ তদন্তে আসিলে সকলই বিদিত হইবেন।' এই পত্রখানি, এক ব্যক্তি 'অস্পষ্ট দাস' এই নাম স্বাক্ষর করিয়া, পুলিশের বড় সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছে। সাহেবের বিশ্বাস হইয়াছে। এইরূপ কলঙ্কজনক ব্যাপার গোপন করা যে জমিদার লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়, সাহেব একথা বিশ্বাস করিয়াছেন। কাজটা বড়ই গর্হিত; সংবাদদাতা জমিদারের ভয়ে নিজের নাম লিখিতে সাহস করে নাই। স্থানীয় পুলিশকে কেবল সহায়তার ভার দিয়া এ মকর্দমার তদন্তভার আমার উপরেই পড়িয়াছে। প্রস্রাব ত্যাগের হিসাবনিকাশ পর্যন্ত যে চাকরিতে ডাইরি-বন্দী করিতে হয়, তাহাতে আর কথা কি? সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মকর্দমাটা

নিজের ডাইরিতে জমা করিয়া লইয়া—সাহেব বরাবর তদন্তরুজুর এত্তেলা দিয়া, গোপন অনুসন্ধানের জন্য বাহির হইলাম।

বড়ই চিন্তিত হইতে লাগিল। ভদ্রঘরের কুলকন্যা, বিশেষ জমিদারের ভগ্নী, অন্তঃপুরেই বাস; কি করিয়া অনুসন্ধান লইব, কি করিয়া প্রকৃত কথা সংগ্রহ করিব, ভাবিয়া আকুল হইলাম। ভয়ও হইল। জমিদার-লোকেরা অসীম ক্ষমতাপন্ন; একটু এদিক ওদিক হইলে, নিজের দেহেরও আশঙ্কা আছে। ঘটেও এমন। যেমন ভয়, তেমনি ভাবনা। এই ভাবেই কৃষ্ণপুরে চলিলাম।

বড় লোকের ঘরে যে এমন সকল কুকাজ ঘটে না, এমন নহে; কিন্তু যাঁহারা ধনশালী, তাঁহারা কি এ লোকলজ্জা সহসা পাইতে চাহেন? অনেক স্থানেই শোনা যায়, দুর্ভাগ্যক্রমে ওই প্রকার কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেলে, বড়লোকেরা নৌকাযোগে অভাগিনীদিগকে গয়া কাশী পাঠাইয়া দেন। দরিদ্র লোকেরা তত ব্যয়বাহুল্যে সমর্থ হয় না—দেশের দুর্নাম অগত্যা তাহাদিগকে শিরোধার্য করিতে হয়। রামতারণ বাবু জমিদার লোক, তিনি কেন এ ব্যয়বাহুল্যে পিছাইলেন? পয়সা থাকিতে তিনি কেন এ কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলেন? একথা সর্বপ্রথম ভাবিবার জিনিস।

স্থানীয় দারগা, রামতারণ বাবুর বড় বৈঠকখানায় বার দিয়া বসিয়াছেন, গ্রামের গণ্যমান্য লোকেরা দারগাবাবুর তলপে হাজির থাকিয়া, সুরৎহালের সাহায্য করিতেছেন, বাজে লোকও বিস্তর জুটিয়াছে। বাড়ির স্থানে স্থানে—এক রকম বাতাবন্দি হিসাবে পুলিশ-পদাতিকেরা বসিয়া আছে। আমার গাড়ি গিয়া সদর দরজায় লাগিল। দারগাবাবুকে হুকুমনামা দেখাইলাম, রামতারণ বাবুর সহিত সংক্ষেপে আলাপ সারিয়া লইলাম। কতকক্ষণ চুপচাপ।

একটু বিশ্রাম করিয়া দারগা যতদূর তদন্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কাগজপত্রে দেখিলাম। মকর্দমা একরকম প্রমাণ। দারগার নথিপত্র, সাক্ষীদের জবানবন্দি, স্থানীয় লোকের মত প্রভৃতি পড়িয়া দেখিলাম। মকর্দমা প্রমাণিত। সে প্রমাণ আটঘাট বাঁধা। বেনামীপত্রের লেখক 'অস্পষ্ট দাস' যে স্থানের উল্লেখ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে একটি শিশুর অর্ধ-বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীদাম ঘোষ, রামতারণ বাবুর খাস খানসামা; সে বলিয়াছে সে নিজে লণ্ঠন ধরিয়া কোদাল হাতে আগে আগে গিয়াছে, রামতারণ বাবু বিধবা ভগ্নীর মৃতপুত্র লইয়া, পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়াছেন। শ্রীদাম গর্ত খুঁড়িয়া দিয়াছে, রামতারণ বাবু শিশু-শব গর্ত-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া মাটি চাপা দিয়াছেন। দুইজন জেলে অন্দর-পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, তাহারাও দিদি-ঠাকুরানির উদর ভার দেখিয়াছে; নিম্ন উদর স্ফীত দেখিয়াছে। সে কথা তাহারা তাহাদের পরিবারের কাছেও গল্প করিয়াছে। তিন সাক্ষীর বাক্য ঐক্য হইয়াছে, লাশও পাওয়া গিয়াছে, তবে আর অন্য প্রমাণের কি প্রয়োজন? দারগাবাবু, দিদিঠাকুরানিকে থানায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। রামতারণ বাবু বলিতেছেন, 'যাহা করিতে হয়, আমাকে করুন। প্রাণদণ্ডেরও যদি অপরাধ হইয়া থাকে, সে অপরাধ আমার হইয়াছে, আমি করিয়াছি। ভদ্রবংশের কুলকন্যা, তাহাকে আর থানায় লইয়া যাইবেন না;—একটা গণনীয় বংশে এ কালি আর দিবেন না।'

বেলা হইয়াছে, তদন্ত স্থগিত রাখিতে বলিলাম। গ্রামস্থগণকে বৈকালে আসিতে অনুরোধ করিয়া, সে বেলার জন্য মজ্‌লিস্ ভঙ্গের আদেশ দিলাম। পাকশাকের আয়োজন হইতে লাগিল।

অবিশ্বাসের অনেকগুলি কারণ আছে। রামতারণবাবু তাঁহার ভগ্নীর জারজ-সন্তান পুকুর পাড়ে পুঁতিলেন কেন? বাড়ির ভিতরেও ত প্রচুর স্থান আছে। রাস্তা হইতে অন্দর প্রায় ৭/৮ রশি দূর। সাতমেসে নির্জীব ছেলের কান্না কি তত দূরে শোনা যায়? যে সকল গ্রামস্থ লোক মজ্‌লিসে বসিয়াছিল, তাহার একজনও রামতারণবাবুর এই অপমানজনক ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করে না কেন? কাওরা হরিশের বধূর এজেহার লওয়া হইল না কেন? যাহা হউক, সর্বপ্রথমে একবার সৌদামিনীকে দেখা উচিত। রামতারণবাবুকে গোপনে ডাকিয়া, মোলায়েম কথায় বলিলাম, 'দেখুন মহাশয়, পুলিশের লোক হইলেও আমরা মানীলোকের মানের কদর জানি। যে আপনার ভগ্নী, আমারও সে ভগ্নী, ধর্ম ভগ্নী। তাঁহার জবানবন্দী লইতে চাহি না; একবার দেখিব। গুরুতর সন্দেহের ভঞ্জন জন্য তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি একবার দেখা আবশ্যক। হয়ত তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে। আপনিও উপস্থিত থাকিবেন, নির্জনে তিনজনে দেখা করিব।' স্বীকৃত হইয়া রামতারণবাবু অন্দরে প্রবেশ করিলেন; দেখা সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিলেন,—দেখা করিলাম। বড় ঘরের মেয়ে, সুন্দরী বটেন। বয়স একুশ বাইশ, বাল্যবিধবা। সৌদামিনীকে দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। এ পর্যন্ত সে জলবিন্দুও খায় নাই। যে দাদার অন্নে প্রতিপালিত সেই দাদার জাতকুল যাইতে বসিয়াছে; আহারে কি রুচি থাকে? সৌদামিনী যে মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া, সৌদামিনীকে বেশ করিয়া দেখিলাম। সন্দেহ রইল না। সবে মাত্র সাত মাসের গর্ভ যে পাত করে, তাহার দেহের অবস্থা কখনই এমন থাকিতে পারে না। জোর করিয়া বলিতে পারি, সৌদামিনী এ কলঙ্কের কিছুমাত্র জানে না। তাহার চরিত্র নির্মল, কিন্তু প্রমাণ কি? অনুকূল প্রমাণ ত কিছুই নাই। বাহিরে আসিলাম।

দারগাবাবু ক্রমেই চটিতেছেন। এমন প্রমাণী মামলা, চালান দিতে আর বিলম্ব কেন? দারগাবাবু অলক্ষ্যে নানা কথাই কহিতেছেন। এত বড় এক মকর্দমা, তদন্তের খ্যাতিটা পাছে আমার একায়িকের ভাগ্যে ঘটিয়া যায়, এজন্য বড়ই বিরক্ত হইতেছেন। নীরবেই সে সকল সহিতেছি। মনে বুঝিতেছি, ঘটনার মূলে রহস্য আছে; তবে কেমন করিয়া তাড়াতাড়ি একটি ভদ্রবংশের কুলনারীকে চালান দিই?

অনুসন্ধানে জানিলাম, গ্রামে দলাদলি। গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-গণের ব্রহ্মত্র মহাত্রাণ নিষ্কর[১] ভূমি আছে; মালে লাখিরাজে বিবাদ বিসম্বাদ আছে; উভয় দলেরই হাতে লোকজন আছে; কয়েকটা খুব সঙ্গিন-সঙ্গিন মকর্দমাও হইয়া গিয়াছে। যে জেলে দুজন সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা ব্রহ্মত্র জমির প্রজা। তলপ করিলাম। জবানবন্দী লইলাম। তাঁহারা পূর্বকথিত কথারই পুনরাবৃত্তি করিল। দিদি ঠাকুরানির বয়স জিজ্ঞাসা করিলাম। একজন বলিল, বছর ত্রিশ, একজন বলিল, পনের ষোল। দেখিতে কেমন? একজন বলিল কাল, একজন বলিল ফরসা। পুকুরের কোনদিকের ঘাটে দিদি- ঠাকুরানি স্নান করিতে নামিয়াছিলেন? একজন বলিল পশ্চিম দিকে, একজন বলিল পূর্ব দিকে। অনেকটা রহস্যভেদ হইল। সৌদামিনীর বয়স কুড়ি একুশ সে গৌরাঙ্গী; অন্দরপুকুরের পূর্বদিকে ঘাটই নাই, উত্তরদিকে ঘাট। জেলেরা আদৌ দিদি-ঠাকুরানিকে দেখে নাই,— চিনে না। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য বাড়ির আর পাঁচটি মেয়েকে ডাকিয়া—দুই দল করিয়া—একদলে সৌদামিনীকে তাহাদের মধ্যে রাখিয়া শনাক্ত করান হইল; জেলেরা দিদি-ঠাকুরানিকে চিনিতে পারিল না—নজরবন্দি রহিল।

শ্রীদাম বলিয়াই ছিল, এখন তলপ করিতেই আর তাহাকে পাওয়া গেল না! অনুসন্ধানে শ্রীদাম বলিয়াছিল, সে কোদালী দিয়া গর্ত খুঁড়িয়া দিয়াছে; গর্ত দেখিলে কিন্তু তাহা খন্তা দিয়া খোঁড়া স্পষ্ট বোধ হয়। গর্তের পাশে দুই তিন স্থানে খন্তার ফলার দাগও রহিয়াছে। খন্তা দিয়া গর্ত খুঁড়িয়া মাটি তুলিবার সময় লোকে খন্তাখানা গর্তের উপর পুঁতিয়া রাখে, সেই সময় গর্তের বাম ধারে ফলার দাগ পড়ে; কেন-না, লোকে বাম হস্তে খন্তা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে গর্তের মাটি তুলে। এখানেও ঠিক তাহাই দেখা গেল। বেশই বুঝিয়াছিলাম, সৌদামিনী গর্ভপাত করে নাই, এখন তাহার অনুকূলে প্রমাণও মিলিতেছে।

মজলিসে কোনও প্রসঙ্গ শেষ হইবার পর মজলিস্ ভাঙিয়া যখন মজলিসীরা চলিয়া যায়, তখন পথে সেই প্রসঙ্গেরই আলোচনা চলে। এ নিয়ম চিরন্তন। মজলিসি লোকদিগের মতামত জানিবার জন্য, সায়াহ্নের মজলিস ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ু লইয়া বাহির হইলাম। একটু দূরে—যেখানে গিয়া লোক বেশ নির্ভয়ে মনের কথা বলিতে পারে—ততদূরে—রাস্তার ধারের একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইলাম। তখন অনেক রাত্রি।

চারি পাঁচজন লোক চলিয়া গেল। তাহাদের কথায় তেমন কিছু পাইলাম না। তারপর আর দুইজন; তাহারা নীরব। তাহার পর তিনজন, ছোটবড় কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে দেখিয়া, তাহাদের কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলাম। একজন বলিল, 'নির্ঘাৎ চোট্! এবার আর বাছার উদ্ধার নাই। জমিদারি হেক্‌মতি আর ফলাইতে হইবে না। মুখ চূণ।'

২য়। তাহাই হইত বটে, কিন্তু মকর্দমা যে দাঁড়ায়, এমন বুঝি না। লেড়ে ব্যাটা মকর্দমাটা উল্‌টাইবার চেষ্টায় আছে।

১ম। আরে রেখে দাও তোমার লেড়ে ভেড়ে। লাশ যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন নির্ঘাৎ!

৩য়। এ লোকটা কিন্তু সুচাকের নয়। ব্যাটার চাউনি দেখিলে পেটের পিলে চম্‌কাইয়া যায়। কোথাকার ঘটনা, কেমন টানিয়া টানিয়া বাহির করিতেছে দেখিতেছ? জেলে দুটা ত এক রকম নাকচ হইয়া পড়িয়াছে। কাহার কপালে কী হয়, বলা যায় না।

১ম। আরে তোর ভয় দেখে যে আর বাঁচি না। 'খোদার মোর্দা রাজি, কি করিবে কাজি।' লাশ যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন শিব আসিলেও তারণের নিস্তার নাই।

৩য়। তোমরা যতই বল, আমার কিন্তু ভয় ঘুচিতেছে না। কাল সকালেই আমি জামাই বাড়ি চলিয়া যাইব।

১ম। আরে তোর ভয় দেখে আর বাঁচি না। মোছলমানের মড়া, রাত্রি দুপুরে কবর খুঁড়িয়া যখন চুরি করিয়া আনিস্, তখন ভয় পাস্ নাই?

৩য়। তখন সাহস ছিল। আশেপাশে তোমরা সহায় ছিলে। রায় মহাশয় অভয় দিয়াছিলেন। এখন?

১ম। যাহা হইক, কাল ত চালান যাক্। ভাই বোনে ত গারদে পচুক—তারপর অন্য কথা।

পর পর তিনজনেরই বাড়ি দেখিয়া আসিলাম। যে লোকটা মুসলমানের ছেলেটাকে কবর খুঁড়িয়া তুলিয়াছিল, কথার ভঙ্গিতে বুঝিলাম, লোকটা বড় ভয় পাইয়াছে। পাছে জামাইবাড়ি পালায়, একজন পদাতিককে পাহারায় রাখিলাম।

প্রভাতেই তাহার বাড়ির দরজায়। নাম অদ্বৈত ঘোষ। চোক্ মুছিতে মুছিতে যেমন বাইরে আসা, অমনি গেরেপ্তার;—একবারে হাতে

হাতকড়ি। অদ্বৈতকে শূন্য ভরেং রামতারণ বাবুর বাড়ি আনা হইল। রামতারণ প্রদত্ত রায় ফয়সালা দেখিলাম; এ পর্যন্ত তাঁহার সহিত যতগুলি মকর্দমা হইয়াছে, অদ্বৈত তাহার সকলগুলিতেই লিপ্ত আছে। সঙ্গের লোক দুজনও পূর্ব পূর্ব মকর্দমার সাক্ষী ছিল।

একদিকে কড়া তহশিল, অন্যদিকে সরকারি সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করিয়া খালাস করিয়া দিবার প্রলোভন; অদ্বৈত যে কবর হইতে লাশ আনিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। খোদাবক্স সেখের স্ত্রী, এক হপ্তা হইল একটি মৃত-সন্তান প্রসব করিয়াছিল; খোদাবক্স ওই কবরেই তাহাকে গোর দিয়াছিল।

সুপ্রমাণিত হইল, রামতারণকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে গ্রামের লোক এই মিথ্যা মকর্দমা সাজাইয়াছে। জেলেরা ব্রহ্মত্র জমির প্রজা, তাহারা মুনিবের উপদেশমত সাক্ষ্য দিয়াছিল, বাস্তবিক অন্দরের পুকুর তাহারা দেখে নাই। শ্রীদাম যখন ফেরার, তখন তাহার সাক্ষ্য ত মিথ্যা। হরিশের স্ত্রী ত ঘটনার কিছুই জানে না। রূপ চাঁদ হাড়ির বধূ সব গুলাইয়া ফেলিল, প্রলাপ বকিল।

মতলব দিয়াছেন, ব্রজবল্লভ রায়। তদ্বির করিয়াছে, অদ্বৈত ঘোষ, রামলোচন রায়, আর দীনবন্ধু বাগচী। চারিজনকেই আসামি করিয়া চালান দেওয়া হইল। শ্রীদামের নামে ফেরারি পরওয়ানা বাহির হইল। আসামিদিগের এক জনও অব্যাহতি পাইল না।

শ্রীদামকে সৌদামিনী কাকা বলিয়া ডাকিত। ঠিক কাকার মতই দেখিত—মান্য করিত। সেই শ্রীদাম, সৌদামিনীর চরিত্রে এমন কলঙ্ক দিল, যাহার অন্নে প্রতিপালিত—সেই প্রতিপালককে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া এমত বিপদে ফেলিতে উদ্যত; দেশময় শ্রীদাম কাকার নিন্দা রটিল। এক সপ্তাহের ভিতরই থানায় সংবাদ আসিল; গ্রামের উত্তর পার্শ্বের

এক তেঁতুলগাছে শ্রীদাম গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে।

সৌদামিনীকে ধর্মভগ্নী বলিয়াছিলাম, মকর্দমা মিটিয়া গেলে, রামতারণবাবু নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। চাকরি ছাড়িয়া, এ ঘটনার প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পরে ধর্মভগ্নীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলাম। তখন আমরা সকলেই প্রাচীন। বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। এ ধর্মসম্বন্ধ, এখনও আমাদের পুরুষানুক্রমে চলিতেছে।

টীকা

১. **ব্রহ্মত্র মহাত্রাণ নিষ্কর**: ব্রাহ্মণকে দান করা জমিকে ব্রহ্মোত্তর জমি বলা হয়। এই জমির দখলিকার, অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ এবং তার বংশকে জমির কর বা খাজনা দিতে হয় না।

২. **মালে লাখিরাজে**: 'লাখেরাজ জমি'-র অর্থ নিষ্কর জমি। 'লা' অর্থ 'না' এবং 'খেরাজ' অর্থে 'ভাড়া' বা 'কর'। লাখেরাজ জমির প্রজাকে মালিকের কাছে কর বা খাজনা দিতে হয় না। যদিও লাখেরাজ জমির প্রজাকে আইনি ভাষায় লাখেরাজদার বলা হয়, এক্ষেত্রে মালে লাখিরাজে বাক্য-বন্ধে লাখেরাজ জমির মালিক ও প্রজাকে বোঝানো হয়েছে।

৩. **শূন্য ভরে**: যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই।

দেওয়ানজি

ভীষণ উৎপীড়ন—প্রজার ধর্মঘট—
প্রাচীরের গায়ে গাঁথিয়া খুন!

ব্রজেন্দ্রবল্লভ রায় চৌধুরী, রূপনগরের জমিদার, নীলকর,[১] মহাজন[২]। রূপনগরের প্রজারা হাতে গলায় জমিদারের কাছে বাঁধা। জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপ, অসীম ক্ষমতা, অকুতো সাহস। তরফ রূপনগরের এলাকায়, বাঘেবাছুরে একঘাটে জল খায়। নিকটেই সরকারি দেওয়ানি ফৌজদারি আদালত আছে; আদালতে হাকিমেরা আছেন; হাতে কাজ নাই। মহকুমার সর্বত্রই তরফ রূপনগরের এলেকাধীন। জমিদারই এলেকার দেওয়ান ফৌজদার। মালি মকর্দমার একটিও সরকারি আদালত পর্যন্ত আইসে না; জমিদারই জজ, জমিদারই মাজিষ্ট্রেট। রূপনগরের প্রজারা ভূত খাটুনি খাটিয়া কিছু ফসল উৎপন্ন করে, সমস্তই জমিদারের গোলায় উঠে; আজীবনই প্রজারা জমিদারের গোলা হইতে ধান কর্জ করিয়া খায়; টাকা কর্জ করিয়া বাজারহাট করে। এইরূপেই প্রজাদের দিন কাটিতেছিল; জমিদারের দুয়ারে জীবন বিনিময় দিয়া তাঁহারই কৃপায় একবেলা বাসিমুখে জল দিতেছিল; জমিদার দাদন বন্ধ করিয়াছেন। জমার উপর টাকার সিকি বৃদ্ধি না দিলে, জমিদার-মহাজন প্রজাকে আর ধান দিবেন না। প্রজারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে।

একদিন গেল। মণ্ডল মাতব্বরদিগের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়াছে; ভাবিয়া চিন্তিয়া সলা-পরামর্শ করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে

না। প্রাতে যে সকল যুবা পুরুষেরা মাঠের কাজে গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়া ভাত পাইল না। বেচারারা নীরবে রাত্রি যাপন করিল। পরদিন যাহারা খুবই সবল—তাহারা মাঠে গেল; বুড়া-ছোঁড়ারা ঘরেই রহিল। ইতিমধ্যে দেওয়ানজি মহাশয় প্রজাতলব দিলেন। জমিদারের বড় বড় বাঁশ-লাঠি হাতে ভোজপুরি পেয়াদারা আসিয়া, অনাহারক্লিষ্ট মণ্ডললোকদের কাছারি লইয়া গেল। দিনে দিনে বাকি-বকেয়া পরিশোধ না করিলে, দেওয়ানজি প্রজার জাত আবরু খাইবেন। প্রজারা ফেল-জামিন[৩] দিয়া ঘরে ফিরিল। পাড়ার গোঁয়ার লোকেরা ধর্মঘট করিল। ধর্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, শালাদের 'দ্যাখ্—মার কর। ধর—আর মার। খাজনা কেহ পাই পয়সাও দিব না। নালিশ করে, ফাটক খাটিব। বরকন্দাজ আসে, হাঁকাইয়া দিব, না শোনে—মারিয়া তাড়াইব।' তরফ রূপনগরের সাতাশ মৌজায়—রাত্রি মধ্যে এইরূপ ধর্মঘট হইয়া গেল।

এই যে প্রজা বিদ্রোহ; এই যে এত মামলা-মকর্দমা[৪]; এত খুন-খারাপি—দাঙ্গাহাঙ্গামা; ইহার মূলই বেণীমাধব ঘোষ। তদন্তেও প্রকাশ, এ কথা মিথ্যা নহে। নিরুপায় প্রজাকুল আকুল হইয়া বেণীমাধবের শরণ লইয়াছিল; তিনি মানুষের মত মানুষ; বিপন্ন প্রজাকে অভয় দিয়াছিলেন, উপকারও করিয়াছিলেন। এ কথা রাষ্ট্র হইতে অধিক সময় লাগিল না। অচিরে এ সংবাদ দেওয়ান আদ্যনাথ বিশ্বাসের কর্ণগোচর হইল; দেওয়ানজি প্রতিকার পথ উদ্ভাবনায় মৌনী হইলেন।

এ প্রদেশের পূজনীয় শ্যামাচরণ তর্কবাগীশের সাত পুরুষের ভোগ-দখলি সিদ্ধনিষ্কর ব্রহ্মোত্তরভূমি, অন্যূন একশত বিঘা—তৎসহ পুকুর বাগান আওলাৎ[৫], দেওয়ানজি কাড়িয়া লইয়া মালের সামিল

প্রজাবিলি করিয়া দিয়াছেন; ব্রাহ্মণের ত্রিশ বৎসরের নেমকের চাকর চির-পরিচিত ভূমিতে লাঙল দেওয়ায় মার খাইয়াছে;—দেওয়ানজি লাঙল গরু কাছারি আনিয়া হুকুম দিয়াছেন, ত্রিশ টাকা জরিমানা দিয়া তর্কবাগীশ যেন লাঙল গরু খোলাসা করিয়া লয়। গরীব ব্রাহ্মণ, তত টাকা কোথায় পাইবে? ধারের চেষ্টা করিতেই দিন ফুরাইল। প্রভাতেই পেয়াদা। তর্কবাগীশকে প্রাতঃকৃত্যের অবসর দিল না, কাছারি লইয়া গেল; জরিমানার টাকা আদায় করিবার জন্য বিস্তর অপমান, শেষে ভূমি-আসনে অনাহারে সারাদিন বসাইয়া রাখিল;সন্ধ্যাকালে কাঁদিতে কাঁদিতে তর্কবাগীশ ঘরে ফিরিলেন। বেণীমাধব, তর্কবাগীশকে লইয়া প্রথমে থানায়, পরে মহকুমায় গিয়াছিলেন; প্রতিকারের জন্য নালিশ রুজুও করিয়াছিলেন। নালিশ করিয়া বেণীমাধব ও তর্কবাগীশ বাড়ি ফিরিতেছিলেন, পথের মধ্যে জমিদারের পাইক। কাছারির সম্মুখে পা দিবামাত্রই পাইকেরা শূন্যভরে বেণীমাধবকে যেন উধাও উড়াইয়া লইয়া গেল। তর্কবাগীশ বাড়ি আসিয়া সকলকে এ সংবাদ জানাইলেন।

সদর রাস্তার ধারেই কাছারি বাড়ি। অনেকে বেণীমাধবকে ধরিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছে;—এক গ্রামে বাস—সকলের গলা চেনে; বেণীমাধবের সেই চেনা গলার চিৎকার অনেকেই শুনিয়াছে; আজ দুই দিন বেণীমাধব বাড়ি ফিরিয়া আসে নাই।

বেণীমাধবের কনিষ্ঠ নীলমাধব, দুই দিন কাল পর্যন্ত ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষায় ছিল; বেণীমাধবকে কাছারি লইয়া গিয়াছে তাহাও সে জানে, সুতরাং স্থির থাকিতে পারিল না; থানায় সংবাদ দিল।

স্থানীয় দারগা তদন্তে গিয়াছিলেন, কিনারা করিতে পারেন নাই। আমি নিকটেই ছিলাম, উপরওয়ালার হুকুমমতে, ঘটনার পাঁচদিন পরে তদন্তে রুজু হইলাম।

একজন পদাতিক চুপি চুপি নীলমাধবকে থানায় ডাকিয়া আনিল। পূর্বকথিত বিবরণ এবং তৎসহ দেওয়ানজি ও জমিদারঘটিত অনেক কথা শুনিয়া বিদায় দিলাম। আমি আসিয়াছি, তদন্তের ভার পাইয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। ফলে বুঝিলাম, বেণীমাধবের জিন্দা বা মৃতদেহ বাহির করিয়া দিতে দেওয়ানজি বাধ্য।

সন্ধ্যার সময় থানায় বসিয়া আছি, একটা পাগড়ি বাঁধা লোক খুব দ্রুত পদে আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল। পত্রখানির তিন দিকই বেশি বেশি আঠা দিয়া আঁটা। খুলিতে বহুক্ষণ লাগিল। পত্র খুলিয়া পড়িলাম। পত্রে লেখা আছে—সেলাম জানিবা, কেন আর ইচ্ছা করিয়া বিপদ্ ঘটনার চেষ্টা করহ। তোমার জন্য নগদ দুই হাজার করিয়া দুইটা তোড়া রাখিয়াছি; দরকার বোধকর, লইয়া যাইবা।

পত্র পাঠ করিয়া মর্ম বুঝিতে বিলম্ব হইল না,—পত্রবাহকের অনুসন্ধান করিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে। অন্যমনস্ক ছিলাম, পত্র পাইয়াও সে অন্যমনস্কভাব যায় নাই—লোকটাকেও বসিতে বলি নাই। আরদালি বলিল, সে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। প্রলোভন বটে।

চলিয়া যাওয়া ভাবেই পরদিন যাত্রা করিলাম। অন্যদিকে—অন্য পথে চলিলাম। সারা দিনই বিপরীত দিকে গিয়া প্রায় আট ক্রোশ দূরে এক বাজারে গিয়া বাসা লইলাম। আরদালি তখন আমার সঙ্গে ছিল, পাঁড়ে পাকশাক করিল; আপনি জলযোগই সারিলাম। সে রাত্রি সেই বাজারেই কাটান গেল।

পরদিন প্রভাতে মাঠে মাঠে রওনা। খুব নির্জন মাঠের এক গাছতলায় বসিয়া পাঁড়েকে সাজাইয়া লইলাম। পাঁড়ে লেখাপড়া জানিত, চেহারাও ভাল ছিল; দুই একটা নূতন বেশভূষা যোগ করাতে পাঁড়ে বেশ একজন হিন্দুস্থানি পণ্ডিতের মত দেখিতে হইল।

আগে আগে লইয়া চলিলাম। বাসাবাড়িতে পৌঁছিলাম, বেলা তখন মাথার উপর।

বাহ্যিকে দেওয়ানজি বড় ধার্মিক। কায়স্থ সন্তান, ব্রাহ্মণ দেখিলে শির নত করিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন; তিলক সেবা করিয়া থাকেন, হাই তুলিতে তুড়ি দিয়া 'জয় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর' বলা আছে; এ সকল গুণের পরিচয় অর্ধদণ্ডের ভিতরেই পাইলাম। আমিও সৎশূদ্রঁ, দেওয়ানজি সমাদর করিলেন। আমি ঘরেই খাইব, পাঁড়ের ঘৃত ময়দার ব্যবস্থা হইল।

আহারান্তে বসিয়া শিষ্টালাপ। আত্ম-পরিচয় দিবার জন্যই যত্ন, কথায় কথায় নিজের কথাই পাড়িলাম। পাঁড়েকে লক্ষ করিয়া বলিলাম, 'ইনি অসাধারণ জ্যোতিষী। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিন কালের কোন কিছুই ইহার অগোচর নাই। এ দিকে তান্ত্রিকের চূড়ামণি! শান্তিস্বস্ত্যয়ন—যাগযজ্ঞে ইনি অদ্বিতীয় পুরুষ—বিশেষ সঙ্কট উদ্ধারে, নিবাস অযোধ্যায়, ছিলেন কাশীতে। কাশীতে নরেশ সাত খুনের মকর্দমায় পড়িয়া ছিলেন; প্রমাণের অভাব ছিল না; ইনি হোম করিয়া তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিয়াছেন। নিবাস আমার যশোর। দেশেরই এক জমিদার-মাতা কাশীবাসিনী হইয়াছেন,—আমি তাঁহার অভিভাবক রূপে সেই কাশীতেই থাকি। শুনিলাম, দেশে জমিদার বাবু সঙ্কটে পড়িয়াছেন। ইনি অতি সদাশয় লোক, আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ, আমার প্রতিপালক—জমিদারবাবুর বিপদ-উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন হাঁটাপথে; নৌকাপথে বড়ই কষ্ট! ভালমানুষ কি না, মুখে কথাটি নাই। সাহস দিয়া বলিতেছেন যদি ফাঁস না হইয়া থাকে, তবে খালাস করিব।'

স্থিরভাবে দেওয়ানজি এসব কথা শুনিলেন। উত্তর দিলেন না।

বড়ই চিন্তিত বলিয়া বোধ হইল।

একটু বেলা পড়িতেই যাত্রার আয়োজন করিতেছি, দেওয়ানজি বাধা দিলেন। 'অপরাহ্ন হইয়াছে—এখন আর কোথায় যাইবেন?' দুই একবার অনুরোধ করিতেই সম্মত হইলাম।

সন্ধ্যার সময় বসিয়া, জ্যোতিষী নিজের অসাধারণ বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গতঃ দেওয়ানজি মহাশয়ের পারিবারিক সংবাদ, এক আধটু গুপ্ত গুহ্য কথাও বলিতে লাগিলেন; দেওয়ানজি অবাক্! কাশীর জ্যোতিষী যাইতেছেন যশোর[৭], পথে অতিথি হইয়াছেন; তিনি সে সকল সংবাদ জানাইলেন কিরূপে? জ্যোতিষীর বিদ্যার পরিচয় পাইয়া, দেওয়ানজি যেন বিমর্ষ হইলেন। জ্যোতিষীকে একটু গোপনে লইয়া গিয়া, পা জড়াইয়া ধরিলেন। কামনা,—জ্যোতিষী কিঞ্চিৎ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করুন। পাঁড়ে বেশ চালাক লোক, প্রয়োজনমত অস্বীকার করিয়া, শেষে সম্মতি দিল। স্বস্ত্যয়ন ত্রিরাত্রি করার নিয়ম। অদ্য রাত্রি হইতেই তবে আরম্ভ হউক। এদিকে সময় সংক্ষেপ।

কি প্রকার বিপদ, শান্তির পূর্বে তাহা জানা আবশ্যক। একথা পাঁড়ে দেওয়ানজিকে বলিয়াছিল। 'গ্রামে প্রজাবিদ্রোহ হইয়াছে। আজ কয়েকদিন যাবৎ বেণীমাধব ঘোষ নামে এক প্রজাকে পাওয়া যাইতেছে না। বিদ্রোহী প্রজালোক, বেণীমাধব গুম্‌খুন হইয়াছে বলিয়া রটাইয়া দিয়াচে। সে খুনের অপরাধ দুষ্ট প্রজারা আমার ঘাড়েই চাপাইয়াছে।' দেওয়ানজি এইটুকু মাত্র পাঁড়ের নিকট স্বীকার করিয়াছেন। যথা উপচারে নির্জন গৃহে শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল।

ঘরের ভিতর স্বস্ত্যয়ন হইতেছে, আমরা—আমি, দেওয়ানজি আর

একটি মহুরি, আমরা দরদালানে বসিয়া আছি, গল্পগুজব করিতেছি। সম্মুখের ঘরের খোলা ওসারায়[৮] বসিয়া পাঁচ সাতজন পাইক তামাকু খাইতেছে, কথা কহিতেছে।

স্বস্ত্যয়ন যে ঘরে হইতেছে, সে ঘর দক্ষিণ-দুয়ারি; উভয় দিকে লোকের বাড়ি নাই। উভয় পার্শ্বেও নাই; কেবল দরজার সম্মুখ দিয়া সদর রাস্তা। দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরের পশ্চাতে বন; সেখানে কাছারির লোক মলমূত্র ত্যাগ করে, অন্য কেহ সেদিকে বড় যায় না। সেইদিকে শৃগাল কুক্কুরে ঝগড়া। তৎক্ষণাৎ একজন পাইক লাঠি লইয়া গিয়া কুক্কুর শৃগাল তাড়াইয়া দিয়া আসিল। একটু পরেই—অর্ধদণ্ড মাত্র অতীত হইতে না হইতে আবার কলরব। এমন ক্রমান্বয়ে পুনঃ পুনঃ। পাইকগণ নাজেহাল পরেশান হইয়া উঠিল। ভাবে বোধ হইল, শৃগালেরা সারারাত্রিই গোলযোগ করিতেছে, আমরা বাহিরের ঘরে ছিলাম, শুনিতে পাই নাই।

খাবার লইয়াই কুক্কুর শৃগালের বিবাদ। ঘরের পেছনে শৃগালেরা এমন কি খাবার পাইল যে, সারারাত্রিতেও তাহা ফুরাইতেছে না? একটু কৌতূহল হইল।

শৌচের অছিলায় উঠিলাম। লণ্ঠন গাড়ু লইয়া, শৌচে চলিলাম। দেওয়ানজি বলিলেন, 'বাসাবাড়ির পূর্বদিকে বেশ খোলা মাঠ, সেই দিকে যান। উত্তর ধারটা বড় বন' পূর্বদিকেই চলিলাম। একটু দূরে গিয়া—সেইখানে একটু বসিয়া শেষে খুব সাবধানে বাসাবাড়ির দিকে আসিয়া পৌঁছিলাম। আসিয়াই দুর্গন্ধ। আলোটাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া—কাপড়ের ভিতর হইতে যেটুকু আলো বাহির হয়—সেই আলোতে একটু দূরে থাকিয়া দেখিলাম, খাবার কিছু নাই। পাঁচ সাতটা শৃগাল ঊর্ধ্বমুখে কেবল উত্তর প্রাচীরের গা সুঁকিতেছে। খুব

যত্নের সহিতই সুঁকিতেছে। কেবল এই সুঁকিতে পাইবার জন্যই শৃগালে কুক্কুরে এত গণ্ডগোল।

পচা গন্ধ বাহির হইয়াছে, শৃগালেরা খুব উৎফুল্ল হইয়া সুঁকিবার জন্য গণ্ডগোল করিতেছে, অথচ যাহা সুঁকিবে, তাহা তথায় নাই—তবু তাহারা দেওয়াল সুঁকিতেছে। নিকটে গিয়া আরও একবার চারিদিক অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, পচা জিনিস কিছু পাইলাম না। মুক্ত আলোকে দেওয়ালের প্রতি খুব অভিনিবেশের সহিত চাহিলাম; দেখিলাম, কতটা জায়গা যেন একটু ভিজা ভিজা হইয়াছে। প্রাচীরের গায়ের প্রায় ঊর্ধ্ব চারি হাত ও বিস্তার প্রায় দুই হাত;—এতটা স্থান ভিজা। সেই ভিজা স্থান হইতেই দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। সন্দেহ হইল।

আর একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে, সেই ভিজা স্থানটায় যেন বেশ একটা অবয়বের ছবি বলিয়া বোধ হইল। শুদ্ধ প্রাচীরের গায়ে কে যেন জল দিয়া একটি অবিকল মানুষের ছবি আঁকিয়াছে। খট্‌কা লাগিল। সত্বর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আসিয়া দেখি, দেওয়ানজি ঘরের ভিতর—দ্বার রুদ্ধ।

পা টিপিয়া টিপিয়া দাওয়ায় বসিলাম। দেওয়ালের খুব নিকটেই বসিলাম। পাঁড়ে বলিতেছে, 'আমার গণনা মিথ্যা হইবার নহে। কখনও তেমন হয় নাই। বেণীমাধব জীবিত থাকিলে, হোমের ঘৃতে কখনও কালি পড়িত না। সে নাই; সত্য, সত্য, সত্য করিয়া বলিতেছি, সে নাই। তুমি গোপন করিতেছ।' পাঁড়ে থামিল, দেওয়ানজি কথা কহিলেন না। আরও একটু উত্তরের অবসর দিয়া পাঁড়ে আবার বলিল, 'তবে বৃথা আমাকে রাখিলে কেন? দেখ বাবু, তোমার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর আমি জানি। তুমি অজানতঃ যাহা

করিয়াছ, আমি তোমার মুখের উপর এখনি সে সকলও বলিতে পারি; তুমি আমার কাছে চাতুরী কর?—সত্য বল, ঠিক ঠিক রাশি অনুসারে আহুতি দিই, সিদ্ধি হউক। পূর্ণাহুতি দিতে পারিলে, লিখিয়া দিয়া যাইতে পারিতাম;—সাক্ষাৎকাল আসিলেও তোমাকে কাহিল করিতে পারিবে না।'

অত বড় দুঁদে দেওয়ানজি,—পাঁড়ের বাক্যে যেন মুচড়িয়া পড়িলেন; চুপে চুপে যেন কি বলিলেন, পাঁড়ে উচ্চরবে বলিলেন, 'চিন্তা নাই। গণনাতে ঠিক এই ব্যাপারই আমি বুঝিয়াছিলাম; এখন গণনা মিলিয়া গেল। স্থির হও কিছু মাত্র চিন্তা নাই। তিন রাত্রির তিন আহুতিতেই সমস্ত বিপদ্ কাটিয়া যাইবে। অপেক্ষা কর, দেখ। ভক্তি ভরে ততক্ষণ বরং দেবতার কাছে প্রার্থনা কর। আমি এ দিকে হোমের আয়োজন করি। রাত্রিও আর বড় বেশি নাই।' এই বলিয়া পাঁড়ে বাহিরে আসিল। একটু দূরে লইয়া গিয়া সমস্ত কথাই বলিল। সন্দেহ মিটিল। দেওয়ানজিকে প্রবোধ দিবার ভার পাঁড়ের উপর দিয়া, তৎক্ষণাৎ থানার দিকে ছুটিলাম। মরি বাঁচি করিয়া দৌড়িয়া আসিয়াও প্রভাতের পূর্বে পৌঁছিতে পারিলাম না। সর্বাগ্রেই দারগা ও আমি, ঘোড় সওয়ারে রওনা হইলাম; দুইজন বলিষ্ঠ পদাতিক ঘোড়ার সহিত ছুটিয়া যাইতে সম্মত হইল, বাকি লোকও পশ্চাতে আসিতে লাগিল।

প্রায় বেলা দেড় প্রহরের সময় আমরা রূপনগরের কাছারি পৌঁছিলাম। পাঁড়ে বেশ ফোঁটা কাটিয়া বসিয়া আছে, আমার আগমনপথ চাহিয়া আছে। আমিই প্রথমে প্রবেশ করিলাম। দেওয়ানজি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'এ কি মহাশয়, ঘোড়া পাইলেন কোথা?' পণ্ডিতজি বলিলেন, 'আপনি শৌচে গিয়াছেন;

এত বেলা,—আপনার সন্ধানে যে লোক পাঠাইয়াছি। কোথায় গিয়াছিলেন আপনি?'

উত্তরের প্রতীক্ষা না দিয়াই দারগাবাবু প্রবেশ করিলেন। দেওয়ানজির মুখ শুকাইল। সশস্ত্র পদাতিক দুইজনও পৌঁছিল। প্রথমেই দেওয়ানজির হাতে দড়ি পড়িল। দেওয়ানজিকে পাঁড়ের হেপাজতে রাখিয়া, পদাতিক দুটিকে সেই উত্তর প্রাচীরের কাছে পাহারায় বসাইলাম। অন্যান্য লোকজন সব আসিলেই হয়।

যাহাদিগের আসিবার কথা ছিল, তাহারা আসিল। রাজমিস্ত্রী ডাকিয়া ক্রমে প্রাচীর ভাঙা আরম্ভ হইল। অতি ভীষণ ব্যাপার। মনে করিলেও বুকের রক্ত জল হইয়া যায়। দেওয়ানজি, বেণীমাধবকে প্রাচীরের সঙ্গে খাড়া গাঁথিয়াছে। আটদিনের লাশ, পচিয়া কতক কতক বিকৃত হইয়া গিয়াছে; তবে সেই গলিত মাংসসহ দেহের কঙ্কালটা যেন দাঁড়াইয়া আছে। দণ্ডায়মান অবস্থাতেই পুঁতিয়াছে, কি অগ্রে হত্যা করিয়া শেষে পুঁতিয়াছে, লাশ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে গ্রামের লোক, নীলমাধব, সকলেই একবাক্যে বলিল—শোনাক্ত করিল,—এ লাশ বেণীমাধবেরই বটে।

বলিতে কি, দেওয়ানের উপর বড়ই রাগ হইয়াছে। এরা কি পশু? এমন নৃশংসভাবে হত্যা করিতে প্রাণে কি একটু দয়া—একটু কিন্তু—একটু ভয় হয় না। আসামি কবুল করাইবার জন্য রীতিমত পীড়ন আরম্ভ হইল। যে তিনজন রাজমিস্ত্রী বেণীমাধবকে প্রাচীরের গায়ে গাঁথিয়াছিল, তাহারা কবুল জবাব দিল; তবে জীবন্ত বেণীমাধবকে দেওয়ালে গাঁথার প্রমাণ হইল না। পাইকগণের প্রহারেই বেণীমাধব মরিয়া যায়, শেষে এইভাবে লাশ গোপন করা হইয়াছিল। পাঁচজন পাইকও এই মকর্দমার আসামি হইল। চালান

গেল মোট আসামি নয়জন। বিচারে একজনও মুক্তি পাইল না। সেই প্রজা-বিদ্রোহের পর হইতে রূপনগরের জমিদারবাবুদের অবস্থা ক্রমে হীন হইতে লাগিল। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে, জমিদারবংশের একটি প্রাণীও বাস্তু ভিটায় সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে রহিল না।

টীকা

১. **নীলকর**: ভারতবর্ষে ইয়োরোপীয় নীল চাষকারীদের নীলকর বলা হত। কিছু সংখ্যক দেশি জমিদারও নীল চাষ করাতেন। তাঁরাও নীলকর হিসেবেই গণ্য হতেন। নীল চাষ সব থেকে বেশি হত বাংলায় এবং বিহারের কিছু অঞ্চলে। এই চাষে চাষীদের কোনও লাভ হত না। কিন্তু নীলকররা নীল বিদেশে রপ্তানি করে বহু লাভ করতেন। দেশীয় কৃষক, জমির প্রজা এবং মজুরদের নীলকররা এমনভাবে ফাঁদে ফেলতেন, যাতে তারা বংশানুক্রমে, প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে চাষ করতে বাধ্য হত। নীল চাষ করার জন্য রায়তদের দাদন বা অগ্রিম দিত কৃষকরা। কিন্তু দাদন একবার গ্রহণ করলে আর মুক্তির উপায় ছিল না। নীলকরদের লাঠিয়াল এবং অন্যান্য কর্মচারীদের কাছে ভীষণভাবে অত্যাচারিত হত কৃষকরা। নীলকরদের অত্যাচারের পেছনে এবং কৃষকদের নীল চাষ করতে বাধ্য করায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিচালিত সরকারের মদতও ছিল যথেষ্ট। ১৮৫৯ সাল নাগাদ নীলচাষ বিরোধী গণআন্দোলন শুরু হয় প্রধানত নদীয়া এবং যশোহর জেলায়। সেই আন্দোলন নীলবিদ্রোহ নামে খ্যাত।

২. **মহাজন**: কখনও বৈষ্ণব-পদ রচয়িতা বা ধার্মিক এবং মহৎ ব্যক্তিকে মহাজন বলা হয়ে থাকলেও, এক্ষেত্রে, মহাজন শব্দে বড়ো ব্যবসায়ী বা কুসীদজীবী কিংবা যে ব্যবসাদার অন্যকে সুদে টাকা ধার দিয়ে বা রসদ কিনে দিয়ে ব্যবসার মূলধন জোগায়—তেমনই কাউকে বোঝানো হয়েছে।

৩. **ফেল-জামিন**: যে জামিন গৃহীত বা accepted হয়নি।

৪. **মালি মকর্দমা**: মামলা-মোকর্দমা বা কেস-কামারি, প্রভৃতির মতো চলতি কথা। 'মণি মোকর্দমা' বা 'Money Suit' যার অর্থ টাকা আদায়ের মামলা, থেকে মালি-মাকর্দমার শব্দবন্ধ উদ্ভূত হয়ে থাকা সম্ভব।

৫. **আওলাৎ**: ইংরেজিতে যাকে appurtenance বলা হয়। যেমন, কোনও জমিতে অবস্থিত বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা সেই জমির আওলাৎ।

৬. **সৎশূদ্র**: শূদ্র-জাতীয়, কিন্তু সামান্য উঁচু গোত্রের। যে শূদ্র-জাতীয় ব্যক্তি শূদ্র হয়েও ভৃত্যস্থানীয় না হয়েও অন্য উচ্চবর্গীয় কাজ করে।

৭. **যশোর**: বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে, পূর্বে রাজশাহী হালে খুলনা ডিভিশনের অন্তর্গত জেলা ও জেলা সদর। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী এবং প্রাচীন সমতট জনপদের প্রধান কেন্দ্র ছিল যশোর বা যশোহর। ভারত এবং পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার সময়ে এই জেলার গাইঘাটা এবং বনগাঁ ছাড়া বাকি অংশ পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, কপোতাক্ষী, প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নদী।

৮. **ওসারা**: ঘরের সামনের প্রশস্ত এবং উন্মুক্ত চবুতরা বা বারান্দা।

হারানী

চুরি!—খুন!

ছোট একটা মকর্দমার তদন্ত সারিয়া—তিনদিন ক্রমান্বয়ে গো-শকটে আসিয়া বাসায় পৌঁছিয়াছি, সহকর্মীদের দয়ার শরীর—কুশল জিজ্ঞাসার পূর্বেই জানাইয়া দিলেন, শ্রীযুক্ত কর্তা সাহেব বড় চটিয়াছেন। ঘড়ি ঘড়ি সংবাদ লইতেছেন। সর্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, নিদ্রায় চক্ষু ভাঙিয়া পড়িতেছে, শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছে;—বিশ্রাম করিবার অবসর পাইলাম না। তাঁবুতে গিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইলাম। সাহেব, মেমসাহেবের সহিত এতক্ষণ বেশ রঙ্গরহস্য করিতেছিলেন—মুখভরা হাসি ছিল; আমাকে দেখিয়াই গম্ভীর। বামপদের টক্করে কেদারাখানা দূরে ফেলিয়া দিয়া, সাহেব একেবারে আমার আধহাত তফাতে আসিয়া হাজির। খুব রাগ প্রকাশের ভঙ্গিতে বড়সাহেব বলিলেন, 'তোমার কি ইয়াদ নাই? এই ছোট ছোট মকর্দমার তদন্তে এত বিলম্ব। বড়ই দোষের কথা। সাবধান হও। ওই ডাইরি দেখ।—আজই রওনা হও। একমাস সময়, ঠিক গণা ত্রিশটি দিনের ভিতর তদন্ত শেষ করা চাই।'

অতি বদ ফরমায়েস। তদন্তের এখনও কোন উপকরণই পাই নাই, অথচ একমাসের মধ্যে শেষ চাই। অগত্যা সম্মতি জানাইয়া বাসায় আসিলাম। আহার করিয়া, শুইয়া শুইয়া নথিপত্র দেখিতে লাগিলাম। প্রথমেই ফরিয়াদির জবানবন্দি; তাহার অনুলিপি এই;—

'আমার নাম হারানী। ঘর বাকুণ্ডা[১]। মোর কেউ নাহি। মোর আংদা

(পিতা) দরবেশ লিয়ে পরদেশ গেলা, সেহু আর ঘুমিল নাহি। মো নান্দার (পিতামহ) হিল্লে[২] ছিল্। বয়েস জানি না। (অনুমানে ১১ বৎসর)। জাতে মোরা মাহত (বৈশ্য) নান্দার নাম জীবনা মাহাত। নান্দা বড় লেখুয়া পড়ুয়া আছিলা। বুঢ়া আর মুই খাতুন পরতুন। নান্দা কামকাজের লায়েক ছিলো নেই। নান্দা মুটী মুটী টাকা লেনদেন দিতেন। দিনু দিনু বুঢ়া সমঝাতন, মই মরিলা তুহুই বহুৎ মুটী ধন পাইবা। মহু মোহাজন সুজনা মাহতর হাকুটু হাকুটু পছন্তু। ঐ মানুষ তোহারে ধন দিবা। সেই লিখন পঢ়ন কুঞ্জি ভিতর দেখ্তুন। শনির বার দেড় পহরে একটা ফানুৎ[৩] ডাকু বুঢ়ার শিরে বাড়ি দিলা, মুইকো বাড়ি দিলা। ধনকড়ি মুটী সবহি ছিনু লিনা। বুঢ়া কৈ ফানুৎ ডাকু মারি দিলা।'

ফরিয়াদি এজাহারের সহিত দারগার তদন্ত মন্তব্যও লেখা আছে। দারগা তদন্তে লিখিয়াছেন,—

'মাহত[৪] বস্তির হারাণী নামে ছুক্রি তাহার ঠাকুরদাদা জীবনা মাহতকে ডাকাতে হত্যাজনকভাবে[৫] লাঠির আঘাতে হত্যা করে ও তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি ধনদৌলৎ বে-আইনি ভাবে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় সংবাদ দিলে, অধীন সরেজমিন তদন্তে গিয়া ব্যাওরা[৬] অবগত হওনানন্তর জানিলাম, জীবনাকে ডাকাতেই হত্যা করিয়াছে। এতদঞ্চলে হত্যাকারীর কোনও অনুসন্ধান না পাওয়া গতিকে লাশ জ্বালাইবার আদেশ দিয়া এবং উক্ত ডাকাত ধরিবার জন্য পাঁচশত টাকা ইনাম ঘোষণা করণান্তর এবং হারাণীকে এইক্ষণশুক্[৭] অন্য এক মাহতের জিম্মায় রাখিয়া এবং তাহার ঠাকুরদাদার ত্যক্ত স্থাবরাস্থবর সম্পত্তি ফিরিস্তি মোতাবেক প্রজা জিম্মা করিয়া অধীন থানায় আসিয়াছি। বিদিতার্থ নিবেদন ইতি।'

'২ দফা। তদনন্তর জীবনা মাহত, তাহার পৌত্রী উক্ত হারাণী

ছুক্‌রির আখেরের জন্য কিছু টাকা সুজনা মাহতের হাতে গচ্ছিত রাখার হাল অবগত হওয়ানন্তর অধীন উক্ত প্রশংসিৎ মাহতের সহিত দেখা করিলে, উক্ত মাহত একখানা কোনাকুনি ছেঁড়া কাগজ অধীনের হাতে দেয় এবং ইহার অপর অর্ধাংশ ফৌতি জীবনার জিম্মায় থাকা এবং তাহা উক্ত ছুক্‌রি দেখাইলে পর মিলজুল করিবার পর টাকা দিবার কথা জীবনা বলিয়া যাওয়ার কথা, প্রকাশ করে। জীবনার ঘরবাড়ি রীতিমত খানা মস্‌রা করিয়াও অধীন বাকি খণ্ড না পাইতে উহা দর্শনার্থ হুজুরে প্রেরণ করিলেক। অত্র এজেহার ও আমার তদন্তনামা ও উক্ত হারাণীর মৃত ঠাকুরদাদার হস্তলিখিত ছেঁড়া কাগজ খণ্ড অত্র থানার পদাতিক শ্রীশঙ্কর পাঁড়ে মারফত পাঠান যায়, হুজুর মালেক নিবেদন ইতি।'

এখন এই মকর্দমার আমাকে কিনারা করিতে হইবে। এ ডাকাত ধরা বড় শক্ত কথা। ডাকাত ধরা পড়ুক বা নাই পড়ুক, ছেঁড়া কাগজের বাকিটুকু চাই; নতুবা সুজনা হারাণীকে টাকা দিবে না, সে আজীবন কষ্ট পাইবে। মাহত জাতি প্রায়ই ধনী, হারাণীদেরও অবস্থা চিরদিনই ভাল। বংশের কেহ কখনও কষ্ট পায় নাই। কাগজটুকু না পাইলে হারাণী বড়ই কষ্ট পাইবে। আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই, হয় ত হইবেই না। শেষে হয় ত দায়ে পড়িয়া তাহাকে অন্য কুপথ অবলম্বন করিতে হইবে। যেরূপেই হউক, কাগজখানা চাই। যদি নষ্ট করিয়া না ফেলিয়া থাকে, সে ছিন্ন কাগজের মূল্য যদি গৃহীতা বুঝিয়া থাকে—তবে সে যত্ন করিয়া উহা রাখিবে।—চেষ্টা করিলে কাগজ মিলিলেও মিলিতে পারে। যে খণ্ড এই নথির সহিত আছে, তাহা ভাল করিয়া দেখিলাম। ছেঁড়া কাগজে এইভাবে এই কয়েকটি কথা লেখা আছে।—

মম সবহু ধনদৌলত হারাণী
বড় বড় সিঙ্গল মহাবৃচ্ছ
রাখিলা ওহি মহাত পরে
এক অষ্টমুটী ধন বহা
ঐহি ধনমুটী সুজনা
হারাণী পাইবা
আরু যে কুচ্ছ
তাহারু সব
হালে জি

একে দুম্‌কা[৯] অঞ্চলের আধা বাঙালা আধা হিন্দি ভাষা, তাহাতে অস্পষ্ট পুরাতন কিতাবতী লেখা, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নথিপত্র লইয়া পরদিনই যাত্রা করিলাম। যাত্রাপুরে পৌঁছিয়া সুজনা মাহতের বাড়ি উপস্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পূর্বের ব্যাপারই জানিলাম। তাহাতে অনুসন্ধানের কোনও উপকরণ মিলিল না। সুজনাকে জীবনা মাহত যেরূপ বলিয়া গিয়াছে, সে তাহার অন্যথা করিতে রাজি নহে। হারাণীকে সে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবে—বিবাহ দিবে, কিন্তু গচ্ছিত টাকা দিবে না। কাগজের আধখানা চাই। কোথায় কাগজ পাইব? বড়ই বিষম সমস্যা।

মাসের আর দিন নাই। এক মাসের মধ্যে হারাণীর পিতামহ-হত্যার তদন্ত সমাধা করিবার হুকুম, সে একমাসের আর পাঁচদিন বাকি। ক্রমেই চিন্তা বাড়িতেছে। আকুল ভাবনা—কিনারা পাইতেছি না।

করেন ভগবান্‌[১১], নাম পায় লোক। সীতামাড়ীর[১২] থানার এক প্রাচীন দারগা ছিলেন, তিনি বড় ভাল বাসিতেন। আমি সে উপযুক্ত কিনা জানি না, তথাপি তিনি স্নেহযত্ন করিতেন। প্রাচীন লোক, অনেক

মকর্দমা তদন্ত করিয়া বহুদর্শিতা হাসিল করিয়াছেন, তিনি যত্নপূর্বক পরামর্শ দিতেন। বসিয়া থাকিয়া আর কি করিব, তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। আর ত দিন নাই। যথাসময়ে সীতামাড়ীতে পৌঁছিলাম, দারগা মহাশয়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলাম, যুক্তি পরামর্শ লইলাম। পরামর্শ সন্তোষজনক হইল না। সে সকল অনুসন্ধান পথ অবলম্বন করিতে সময়ের দরকার, তত সময় ত নাই।

সীতামাড়ীর উত্তর দিকে একটা ইতর পাড়া আছে, সেখানে অনেক ইতর শ্রেণীর লোকেরা যাতায়াত করে। —মন্দভাবেই করে। সময়ে অসময়ে বাবুধরনের লোকেরাও গোপনে গোপনে গিয়া থাকেন। পাড়াটায় দিনের বেলা ভদ্রলোকের বড় একটা কেহ যায় না। কেমন মনের গতি হইল, সন্ধ্যার সময় সেই পাড়ায় চলিলাম। অনেকক্ষণ ধরিয়া পাড়ার মধ্যে ঘুরিলাম; কেহ সন্দেহ করিল না। এক স্থানে কলহ হইতেছে। স্ত্রী পুরুষে কলহ—উপপতি উপপত্নীর কলহ। কলহ-কথায় বুঝিলাম, উপপত্নী বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে—অন্য পরপুরুষকে গৃহে আসিতে দিয়াছে; হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে। সেই জন্যই কলহ। কলহ-কথার ভিতর আর একটু কথা পাইলাম। উপপতিও কোনও স্থান হইতে কুকার্য দ্বারা কতকগুলি অলঙ্কার আনিয়া দিয়াছিল, সে এখন সেসব ফিরাইয়া লইতে চায়। উপপত্নী বলিতেছে, গহনা যদি দিতে হয় ত থানায় দিয়া দিব। এই মর্মেই কতক্ষণ কলহ চলিল।

কলহের ভিতর রহস্য আছে। এখন করি কি? যেটুকু জানিয়াছি, তাহাতে আসামি গেরেপ্তার করিবার অধিকার আমার আছে; কিন্তু এখন ত আমি একাকী। যদি উপপতি চলিয়া যায়। কলহের পরিণামে লোকটা যদি অন্যত্র কোথায় যায়। মুস্কিলে পড়িলাম। কতক্ষণ

একস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। থাকিতে থাকিতে আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া গেল। দাওয়ার উপপতি ঘরে ঢুকিল। তবে আর তাড়াতাড়ি কি? থানায় আসিলাম। রায় মহাশয়কে—স্থানীয় থানার দারগাবাবুকে ঘটনাটা সমস্তই বলিলাম। যে যে কথা উভয়ের মুখে যে যে ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যথাস্মৃতি সে সকল কথা সেই সেই ভাবেই জানাইলাম। তিনি স্নেহের তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, 'জমাদারকে লইয়া এই দণ্ডেই তথায় গমন কর। উপ-দম্পতিকে বাঁধিয়া আনিয়া রাত্রের মত পৃথক্ পৃথক গারদে রাখ। দুজন পদাতিক রাঁড়ির[১২] বাড়ি পাহারা দিক এখনি—আর কাল বিলম্ব নয়।'

তৎক্ষণাৎ পুনর্যাত্রা। বিবাদটা মিটিয়াছে, উপপত্নী দাওয়ার উনানে খড়ম পায়ে দিয়া বসিয়া রুটি সেঁকিতেছে, উপপতি নিকটেই বসিয়া হুঁকা টানিতেছে—খুব নরমসুরে দুই একটা কথাও চলিতেছে, ঠিক এমনি সময়ে আমরা তাহাদের উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া, দুজনে দুজনের হাত ধরিলাম। জোড়া হাতকড়ি দিয়া পদাতিক দুজন তাহাদিগের হেপাজাত রহিল। বাহিরের জিনিস ঘরে তুলিয়া দরজায় চাবি দিলাম। চাবিটা আসামীর নিকটে দিয়া থানায় লইয়া চলিলাম। পদাতিকদ্বয় পাহারায় রহিল।

এতক্ষণ আসামিরা কথাটিও কহে নাই। থানায় আসিয়া তবে মুখ খুলিল। লোকটি রায় মহাশয়ের চেনা। আসামি গারদে তুলিয়া, রায় মহাশয়ের নিকটে বসিলাম। তিনি বলিলেন, 'আসামির নাম রামশরণ, মাগির নাম চুনিয়া। মাগির পিতা সাঁওতালি, মাতা হিন্দুস্থানি। মাতৃপক্ষ ধরিলে চুনিয়া দুই পুরুষে বেশ্যা। রামশরণ আজ মাস তিনেক এখানে আছে। বাড়ি দুম্‌কা। আসিয়া অবধি পাদ্‌রি

সাহেবের বাড়ি চাকরি করিতেছে। রামশরণ সাহেবের বেহারা। সাহেবেরা দয়া করিয়া সময় সময় এখানে আসেন, সঙ্গে রামশরণও আসিত। সেই জন্য চিনি। লোকটা যে এমন স্থানে বাসা লইয়াছে, তা জানিতাম না। যাহা হউক, আগে খানা তল্লাশি কর। কি কি গহনা রামশরণ দিয়াছে, তাহার একটা তালিকা লও—অনুসন্ধান এখন সেই দাঁড়াতেই চলুক।'

রাত্রি প্রভাতে রায়মহাশয়ও চলিলেন। তন্নতন্ন করিয়া দুজনে অনুসন্ধান করা গেল। আসামিরা সঙ্গেই ছিল, বাক্স সিন্দুক যাহা ছিল, সবই খুলিয়া দেখা গেল। রূপার গহনা মিলিল। টুকরা টুকরা যে সকল কাগজ ছিল, তাহাও লইলাম; পড়িয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলাম। একটা ন্যাকড়া বাঁধা কাগজের তাড়ার ভিতর ঠিক সেই ভাবের একখানা কোনাকুনি ছেঁড়া কাগজ পাইলাম। আনন্দে অধীর হইলাম। মিলাইয়া দেখা হয় নাই, ভাষার মিলিত দূরের কথা— হস্তাক্ষরেও মিলাইয়া দেখা হয় নাই, অথচ বিশ্বাস হইল পাইয়াছি? রায় মহাশয়কে কাগজ খানা দেখাইলাম। তিনিও বলিলেন, সম্ভব। বাজে তল্লাশে আর সময় নষ্ট না করিয়া, কাগজখানি ও গহনাগুলি লইয়া থানায় আসিলাম। দ্রুতপদে সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরাটা লইয়া বাহিরে আসিলাম, রায় মহাশয়ও আসিলেন। দুজনে বেশ করিয়া মিলাইয়া দেখিলাম;—দেখিলাম, হারাণীর অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে।

দুই খণ্ড কাগজ একস্থানে করিতে বেশ জোড়ে জোড়ে মিলিয়া গেল। দুখান একত্র করিতে এইরূপ হইল;—

মম সবহ ধনদৌলত হারাণী মাহসীকে দিনু
বড় বড় সিঙ্গল মহাবৃচ্ছ শালতাম বহাগুটী
রাখিলা ওহি মাহত উথার পরে বিক্রু করিয়া দিবন

এক অষ্ট মুটী ধন বহা আরু তিন গোটা রূপা
ঐহি ধনমুটী সুজনা মাহত ভাই রাখিলা
হারাণী পাইবা ভাইর ছিরি গুরু ক্রেপা
আরু যে কুচ্ছ আছিল, সে সবহু হারাণী জমাই
তাহারু সব লইব মুই এহা লিখন করিলা।
হালে জিল মাস পহিলা। ছিরি জীবনা মাহত
ডুঞীয়া হাড়।

পুরাতন দুম্‌কার ভাষা বুঝে, এমন একজন মহুরি থানাতেই ছিল। সে মর্ম বুঝাইয়া দিল। সাদা কথা,—বৃদ্ধ জীবনা মাহত তাহার সমস্ত ধনদৌলত হারাণীকে উইল করিয়া যাইতেছে। আবাদে যে সকল বড় বড় শালতালদি বৃক্ষ আছে, সুজনা মাহত সে সকল বেচিয়া হারাণীকে টাকা করিয়া দিবে। তদ্ভিন্ন আট শত টাকা নগদ আর তিন শত ভরি রূপা জীবনা সুজনার জিম্মায় রাখিয়া যাইতেছে। নিত্য ব্যবহার্য তৈজস সকল গুরু পাইবেন। বাড়িটিতে হারাণীর স্বামী বাস করিবে। দুম্‌কা জেলার পাহাড়ে—বৈশ্য জীবনা, ভাল উইলই ত করিয়া গিয়াছে।

হারাণীর কথা মিটিল, এখন এই লোকটাই কি জীবনাকে হত্যা করিয়াছে? রায় মহাশয় বলিয়াছেন, রামশরণের বাড়ি দুম্‌কায়। জেলাটা একই বটে। রামশরণকে আনিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিল, বাড়ি আমার দুম্‌কায়—রাধাপুর। থানা হলিয়ারনগর। জানা ছিল, বুঝিলাম—রাধাপুর যাত্রাপুরের নিকট। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম। রামশরণের মুখ শুকাইল; অতি কষ্টে বলিল, হ্যাঁ। সন্দেহ ঘনীভূত হইল।

আসামি লইয়া রাধাপুরে চলিলাম। যতক্ষণ প্রাপ্ত গহনা চোরাই বলিয়া কেহ শনাক্ত না করিতেছে—ততক্ষণ ত চুনিয়া রাঁড়ি অপরাধী নয়, নজরবন্দিভাবে রাখা হইল।

রাধাপুর আসিলাম, রামশরণ বাড়ি দেখাইতে পারিল না। একবার এ পাড়া একবার সে পাড়া করিয়া চারিদণ্ড কাল অনর্থক ঘুরাইয়া লইয়া শেষে বলিল, এখানে আমার বাড়ি নয়, বাড়ি আমার ধামসায়। ধামসা এখন হইতে এক ক্রোশ, চলিলাম।

বেলার মধ্যেই ধাম্‌সায় পৌঁছিয়া, রামশরণের বাড়ি পাইলাম। একখানা কুঁড়ে ঘর, তাহাতে বাস করেন রামশরণের এক বুড়া মা। হাতে হাতকড়ি দেখিয়া রামশরণের বুড়া মা বড়ই কাঁদিতে লাগিল; তাহাকে আশ্বাস দিয়া পুত্রের দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম, যাত্রাপুরে রামশরণের বিবাহ হইয়াছে। রামশরণের স্ত্রী বরাবরই সেইখানে আছে। বহুদিন রামশরণ বুড়া মাকে খরচপত্র দেয় নাই—দেখা পর্যন্ত করে নাই; বুড়ি কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল। জানিলাম, রামশরণ যাত্রাপুরে বিবাহ করিয়াছে; সে তবে তখন গোপন করিল কেন? ছেঁড়া চিঠির ক্রমেই কিনারা হইয়া আসিতেছে।

কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া যাত্রাপুর রামশরণের শ্বশুর-বাড়ি চলিলাম। শ্বশুরেরা গৃহস্থ ভাল। চাষবাস আছে; জমা-জমি আছে, আছে ভাল। রামশরণের দুই শ্যালক। দুজনেই বিদেশে চাকরি করে। শ্বশুর বাড়িতে থাকে। শ্যালক দুজনেই তখন বাড়ি ছিল। আমরা যেমন যাওয়া, শ্যালক দুটি বাড়ির ভিতর গেল—আর ফিরিল না। বাড়ির পরিবারবর্গ দেখিতে চাহিলাম। দেখিলাম; সে লোকের ভিতর শ্যালক দুটি নাই। জানিয়া আসিয়াছি, রামশরণের শ্যালকেরা বাড়ি

আছে, বেশ জানি শালারা পলাইয়াছে, শালা হাজির করাইবার জন্য মহা তম্বি আরম্ভ করিলাম। পীড়াপীড়ির পর তাহারা আসিল।

শালা দুটির মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, ইহারা অপরাধী। আসিবামাত্র হাতকড়ি দিলাম। আরও ভয় পাইল। নির্জনে লইয়া গিয়া এজেহার লইলাম। মুক্তির প্রলোভন দিতে উভয়েই স্বীকার করিল। শালা দুই মাত্র রামশরণের সঙ্গে গিয়াছিল। তাহারা জীবনার বাড়ির উঠানেও পা দেয় নাই—তবে লাঠি লইয়া পথে দাঁড়াইয়াছিল, যদি ভগ্নীপতির পথে বিপদ্ ঘটে, সাহায্য করিবে। জীবনাকে হত্যা করিয়াছে, রামশরণ। গহনা টাকা লইয়া আসিয়াছে রামশরণ। শালাদের কিছুমাত্র বখ্‌রা দেয় নাই। —স্ত্রীকেও না, সমস্ত টাকা-কড়ি গহনাপত্র রামশরণ স্বয়ং লইয়া সেই পথে পথেই পলায়ন করেন। পলাইয়া গিয়া সীতামাড়ী থাকে—তথায় চাকুরি করিতে থাকে। রামশরণ কোথায় আছে, শ্বশুরবাড়ির কেহই এতদিন তাহা জানিত না। উভয়েই ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে এই সাক্ষী দিল।

সুজনাকে সংবাদ দিলাম। হারাণীকে লইয়া রামশরণের শ্বশুরবাড়ি আসিতে বলিয়া দিলাম। তাহারা আসিল। কয়েকখানি রূপার গহনা হারাণী শনাক্ত করিল। সে সকল তাহার নিজের গহনা। অন্যান্য গহনা ছিল, তাহার মাতার গহনাও ছিল, কিন্তু সে সকল সে চিনিতে পারিল না। যাহা হউক, এক মাসের শেষ দিনেই তদন্ত শেষ হইল।

হারাণীকে লইয়া মকর্দমা দিন আদালতে হাজির হইবার জন্য সুজনাকে বলিয়া দিলাম। উভয় কাগজ মিল করাইয়া দেখাইয়া, হারাণীর প্রাপ্য টাকাগুলিও সেই দিন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে বলিলাম। আসামি রামশরণকে চালান দিলাম। তাহার শ্যালকদ্বয় তখন সাক্ষীর সামিলে থাকিল।

সাক্ষী দুটি ও চুনিয়া রাঁড়ির খুব কম দিনই কারাদণ্ড হইল, রামশরণের গুরুতর দণ্ডই হইল। হাকিমের সম্মুখে দুই কাগজ রুজু দিয়া, সুজনা হারাণীকে গচ্ছিত টাকা বুঝিয়া দিল। হারাণী সুজনার গৃহেই থাকিবে বলিয়া মত প্রকাশ করায়, তাহারই সহিত সে চলিয়া গেল। বিদায় লইয়া নিজ বাসায় আসিলাম।

টীকা

১. **বাকুণ্ডা**: বাঁকুড়া বা তদ্‌সন্নিহিত অঞ্চল।

২. **হিল্লে**: আশ্রয়। উৎপত্তি আরবি 'হীলা' শব্দ।

৩. **ফানুৎ**: ডাকাবুকো, ডানপিটে বা মরীয়া।

৪. **মাহত**: মাহাতো।

৫. **হত্যাজনকভাবে**: হত্যা করার উদ্দেশ্যে। যাতে মৃত্যু ঘটতে পারে, এমনভাবে।

৬. **ব্যাওরা**: লোকমুখে বা অসমর্থিত সূত্রে।

৭. **এইক্ষণশুক্**: এখনকার মতো বা আপাতত।

৮. **ফৌতি**: মৃত। যে ফওত বা ফৌত হইয়াছে।

৯. **দুমকা**: পূর্বতন বিহার, বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জেলা এবং জেলা সদর। ১৮৫৫ সালের হুল বিদ্রোহের পর ভাগলপুর এবং শিউড়ির অংশ নিয়ে গঠিত সাঁওতাল পরগণার সদর স্থাপিত হয় এই শহরে। দুমকা

অঞ্চলে সাঁওতালি ভাষাও বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। সাঁওতালি ভাষা খেরওয়ারি ভাষা থেকে উদ্ভূত উপভাষা হিসেবে গণ্য হয়।

১০. **ভগবান্**: লক্ষণীয়, বাঁকাউল্লা সাহেব ভগবানের নাম বলেছেন, আল্লার নয়। এতে দারগা সাহেবের ধর্মবিষয়ক উদারতা প্রকাশিত।

১১. **সীতামাড়ী**: উত্তর বিহারের একটি জেলা। পূর্বে মজফ্‌ফরপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৯৭২ সালে নতুন জেলা গঠিত হয়েছে। জেলা সদর ডুমরা। ১৯৩৪-এর এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে সীতামাড়ী শহর প্রায় সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

১২. **রাঁড়ি**: শব্দটির অর্থ বিধবা। 'বেশ্যা' বা রক্ষিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে রক্ষিতা বা উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ!

কুলটার বুদ্ধি—পাপের ভীষণ পরিণাম।

কোনও কাজকর্ম নাই, আহারান্তে ফৌজদারিতে আসিয়া বসিয়াছি। তখন একটা চুরি-মকর্দমা হইতেছিল। আসামি ফরিয়াদি আমার চেনা। শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ সেন এখানকার বড় মোক্তার। যেমন পসার তেমনি রোজগার। সেনজ এখানে সপরিবারেই থাকেন।

সেনজ মহাশয়ের জমাখরচ নাই। নিত্য রোজগারের অর্থ হইতে বাসা খরচ বাবদ দুইটি টাকা গৃহিণীর হাতে দিয়া, বাকি টাকা মোড়ক করিয়া বিজক্‌[১] দিয়া রাখাই সেনজ মহাশয়ের নিয়ম। দশ, পনের, পাঁচ, শত, কখনও বিশ পঁচিশ করিয়া এক একটি মোড়ক, মোড়কের উপর টাকার পরিমাণ আর তারিখ লেখা। এইরূপ মোড়ক একুশ দিনের একুশটি ছিল। ঘটনার তারিখ ২২এ। গত মাসকাবারে তহবিল ঝাড়িয়া চারি শত সাড়ে পনর টাকা হইয়াছিল; তাহা গৃহিণীর গহনার জন্য স্বর্ণকার গৃহে গিয়াছে। গত একুশ দিনের উপার্জন—একুশটি মোড়ক বাক্সে ছিল—সে মোড়ক নাই? চাবি থাকিত গৃহিণীর নিকট, তিনি এ টাকার কিছুই জানেন না। চুরিই স্থির হইল।

সেনজের পরিবার সংখ্যা—তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ, প্রেমদা নামে এক দাসী, পাচক মুকুজ্জে মহাশয় আর দূর সম্পর্কীয় একটি অনাথ ভ্রাতৃপুত্র। সে এই দূরসম্পর্কের কাকার কৃপায়, এখানে থাকিয়া লেখাপড়া করে। নাম প্রবোধ—বয়স সতের আঠার।

উপস্থিত মকর্দমায় এই প্রবোধই আসামি। সব টাকা পাওয়া যায় নাই,

তবে ১৯এ তারিখের বিজক্ দেওয়া, পনের টাকা আট আনার একটি মোড়ক, প্রবোধের কেতাবের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। মোড়কের উপর সেনজের নিজহস্তের লেখা। প্রবোধ সেই সূত্রে আসামি।

প্রবোধের চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, 'দোহাই হুজুর, আমি এ টাকার কিছুই জানি না। আমি চুরি করি নাই।'

চুরি করিতে কেহ দেখে নাই। দারগা গিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রবোধের দপ্তরে ওই মোড়ক পাইয়াছেন। সাক্ষীরা কেবল মাল গেরেপ্তারের মুকাবিলার সাক্ষী। মুকুজ্জে মহাশয় তাহাই বলিলেন, প্রেমদা ঝিও তাহাই বলিল। প্রবোধের খাবার দ্রব্য চুরি করিয়া খাওয়া যে অভ্যাস আছে—প্রেমদা সে কথাও বলিল। সেনজ মহাশয়ও উভয় সাক্ষীর সাক্ষ্য—বাক্যের প্রতিপোষণ করিলেন, প্রবোধের তিনমাস কারাদণ্ড হইল।

চাকদহ[২] হইতে যশোর, হরকরায় ডাক লইয়া যায়। তিন তিনজন সশস্ত্র হরকরা একত্র রওনা হয়। সকলেই রণপায়[৩] যায়। সেদিন চুয়াডাঙ্গার অদূরবর্তী এক মাঠে, ডাকাতে ডাক লুঠিয়াছিল। দেড়মাস ধরিয়া তদন্ত হইয়াছিল, ডাকাত ধরা পড়ে নাই। ডাকের থলিটা ডাকাতেরা ফেলিয়া গিয়াছিল, পুলিশ সে থলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, তাহাতে চিঠিপত্রও বিস্তর ছিল। সেই সকল চিঠির প্রতিলিপি লেখাইয়া শ্রীযুক্ত কর্তা সাহেব প্রত্যেক গোয়েন্দা-পুলিশের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন—যদি তৎসূত্রে কেহ কিছু করিতে পারেন। আমিও তেমন একটা তাড়া পাইলাম। প্রাপ্তমাত্র একে একে সবগুলি পড়িলাম। একখানা চিঠি তিন চারিবার পড়িলাম। সেখানির নকল এই—

জিবোন বঁদু হরিদাস আমার প্রম জানিবা আমী রোজ রোজ টাকা কোতাই পাইবো তুমি কেংপৌনীর[৪] গারদ ভাঙ্গিয়া লুকাইয়া আছো এ সমাই আমি টাকা কোতাই পাইবো সোমপ্রীতি এক সর্ত্ত কয়েক টাকা পাইয়াছি জানিবা গোলমাল মিটিলে তুমীই আসিতে সোংবাদ লিখিবো ঐ টাকা তুমি নিজে রাখিবা না পিসির হাতে দিবা, তুমি এখানে নগদ টাকা হাতে রাখিবা নাই তুমিহ খুব সাবদানে থাকিবা ঠাকুর বড় ভাল মনিষ্য। তিনি এ লেখন লিখি দিলেন তিন সব ওকাকিব আছে জানিবা শ্রীমতী প্রেমদা দাশি বদ্দমানের শ্রীযুৎ প্রাণবল্লব শ্যান মোহাশয়ের নিজ বাঁমা।

মনে পড়িল—এই সেই প্রেমদা। পত্রের লিখিত এই যে ব্রাহ্মণ ঠাকুর—ইনি নিশ্চয়ই সেন মহাশয়ের সেই পাচক মুকুজ্জে মহাশয়। প্রেমদা একশত টাকা কোথায় পাইল? টাকা পাইল যদি, তবে গোলমাল কিসের? বেশ বুঝিলাম, সেন মহাশয়ের ওই টাকা চুরি করিয়াছে—প্রেমদা। সে চুরির কথা পাচক মুকুজ্জে জানে, হয়ত ভাগও পাইয়াছে। মোটের উপর, প্রবোধ নির্দোষ। আগে তাহাকেই মুক্ত করা আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়া বড়সাহেবকে দেখাইয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, 'এখনি তাহাদিগকে গেরেপ্তার কর। টাকা বাহির করিবার জন্য যাহা করিতে হয়, এখনি কর।'

হরিদাস গারদ ভাঙিয়াছে; প্রেমদার লিখিত পত্র যদি সত্য হয়, তবে হরিদাস জেলভাঙা আসামি, পিসিও লোক বড় সহজ নয়। সকলের চরিত্রই ভয়ানক। ইহাদিগকে ধরা চাই। এখন প্রেমদাকে লইয়া টানাটানি করিলে হয় ত সে সকল দাগী আসামি সতর্ক হইয়া পড়িবে। মনের এ অভিপ্রায় জানাইলাম। কর্তা সম্মতি দিলেন। প্রবোধকে জেলের ভিতরই একটু ভাল ভাবে বিনা খাটুনিতে

রাখিয়া—সেন মহাশয়ের বাড়িতে গুপ্ত-পাহারা বসাইয়া—হরিদাসের সন্ধানে চলিলাম। প্রেমদার লিখিত পত্রের শিরোনামা,—

পোরম কর্লনিও শ্রীহরিদাস ঘোষ মহাশয় কর্লাণবরেষু—

পত্র দেনা মোঃ।—কাটোয়াং বোষ্টম পাড়া শ্রীমতী বিদুমুকী বোষ্টমের বাটীতে পৌহুছিলে উক্ত প্রসংশিৎ ব্যক্তি পাইবেক।

যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে কাটোয়ায় পৌঁছিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে—শেষে পিসির দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম, 'পিসিমা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, উত্তর পাইলাম না। ভিতরে মানুষ আছে বুঝিতেছি, তাহারা সাড়া দিতেছে না। অনেক ডাকা-ডাকির পর দরজা খুলিয়া গেল, প্রবেশ করিলাম। কে যে দরজা খুলিয়া দিল, দেখিতে পাইলাম না। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরের ভিতর একটি স্ত্রীলোক সন্ধ্যা জ্বালিবার আয়োজন করিতেছে, দ্বিতীয় লোক তথায় আর কেহ নাই। দাওয়ার উপর একখানা কম্বল পাতা ছিল, তাহাতেই বসিলাম।

আলো জ্বালিয়া—ঠাকুরদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া—অর্ধস্ফুট স্বরে কয়েকবার 'হরি বল্ মন হরি বল্' বলিয়া দাওয়ায় আসিলেন, প্রণাম করিলাম। চিরপরিচিত হইতেও যেন অধিক পরিচিত, এই ভাবে পিসির কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। নানা কথার পর শেষে কাজের কথা। প্রেমদা পিসিকে একবার দেখিতে চায়। সে এজন্য পিসির পথ খরচ পর্যন্ত আমার মারফতে পাঠাইয়াছে। আরও একজন লোক—প্রেমদা তাহার নাম বলে নাই—বলিয়াছে পিসিকে বলিলেই তিনি ইসারায় বুঝিতে পারিবেন, সেই লোকটিকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিয়াছে। টাকাকড়ির মধ্যে কুড়িটি টাকা আমার সঙ্গেই দিয়াছে, আর একশত টাকা তাহার কাছে আছে। সে টাকা তোমরা

গেলেই পাইবে। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ কুড়িটি টাকা পিসির সম্মুখে রাখিলাম। টাকার আওয়াজ হইতেই, ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের কৃষ্ণকায় এক নধর যুবাপুরুষ ঘর হইতে বাহিরে আসিল। বলিল, 'সে ভাল আছে?' আভাষেই বুঝিলাম, এই লোকটাই তবে হরিদাস। বলিলাম, 'ভাল আছে। তোমাকে বিশেষ করিয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছে। পথ খরচ পাঠাইয়াছেন।' হরিদাসই বটে, সে সম্মতি জানাইল। পিসি টাকা লইয়া ঘরে ঢুকিলেই হরিদাস সঙ্গে সঙ্গে গেল, চুপি চুপি একটু কলহও হইল, শেষে—যেন কিছু টাকা লইয়া হরিদাস গাড়ি ভাড়া করিতে গেল। উভয় পক্ষেরই আর অবিশ্বাস নাই।

পিসির কৃপায় আহারটা ভালই হইল। সেই দাওয়াতেই শয়ন করিলাম। গাড়ি ভাড়া করিয়া আসিয়া, হরিদাসও আহার করিল। আহার করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। পিসির সহিত অন্যান্য কথার পর নিদ্রা।

শেষ রাত্রেই হরিদাস গাড়ি লইয়া হাজির। সেই শেষ রাত্রেই রওনা। দুখানা গাড়ি। একখানায় পিসি, অন্য খানায় আমি ও হরিদাস যাইতে যাইতে অনেক কথাই হইল। প্রেমদার আমি আবার না জানি কি? এইভাবে কথা কহিতে লাগিলাম। কথায় কথায় প্রেমদার অনেক কথাই হরিদাসের মুখে শুনিলাম। লোকটা প্রেমিক বটে। ভালবাসার কথা উঠিতেই, আমার জীবনেরও একটা ভালবাসার কথা হরিদাসকে শুনাইলাম। সেই ভালবাসাসূত্রেই ত প্রেমদার সঙ্গে আলাপ। সে ভালবাসার পরিণামে গর্ভ হইয়াছিল, প্রেমদা সে দায় হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছে। হরিদাস বুঝিল, আমি সেই দলেরই বটে। সে আমার এই ভালবাসার ইতিহাসকে দৃঢ় করিবার জন্য আত্মচরিত্রও বর্ণনা করিল। প্রেমদা কায়স্থের মেয়ে। বাল্য-বিধবা। হরিপুরের বসু-বাবুদের না জানে কে? প্রেমদা সেই বসু-পরিবারের

বিধবা কন্যা। হরিদাস, প্রেমদার পিতার খানসামা ছিল। সেই সময় উভয়ের মধ্যে প্রণয় হয়। প্রণয় মূলে প্রেমদার গর্ভ হয়। ক্রমে পাড়ায় পাড়ায় গোল উঠিল—পাপ চাপা থাকিল না, প্রকাশ হইয়া পড়িল। দারুণ লোকলজ্জা সহিতে না পারিয়া, প্রেমদা ও হরিদাস—দুজন হরিপুর হইতে পলায়ন করিল। কাটোয়ায় আসিয়া পিসির কৃপায় তবে প্রেমদা লোকলজ্জার দায় হইতে কোনও রূপে নিষ্কৃতি পায়। প্রেমদা যাহা আনিয়াছিল, তাহা আসিয়াই পিসির হাতে দিয়াছিল; প্রেমদা নিরাময় হইয়া উঠিয়া শুনিল, টাকাকাড়ি আর কিছু নাই। প্রেমদা বিপদে পড়িল। পিসির পরামর্শ—গতর যখন আছে, তখন পেটের ভাবনা কি? হরিদাসও বড় চিন্তামুক্ত হইল।

হরিদাস ইদানীং এক একটু গাঁজা খাইত। গাঁজা খায় বলিয়া একদল গাঁজাখোরের সহিত তাহার আলাপও ছিল। নিত্য নিত্য সন্ধ্যাকালে, গাঁজার মজলিসে হরিদাসের যাতায়াত ছিল। অর্থাভাবে হরিদাস দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে দেখিয়া, সেই গেঁজেলদলেরই একজন হরিদাসের উপার্জনের পথ করিয়া দিবে বলিয়া আশা দেয়। সে গেঁজেল লোকটি একটা ডাকাতের দলের থলেধারী। হরিদাসের চেহারা ছিল, শক্তি ছিল, বুদ্ধিও ছিল; থলেধারী দলের লোকদিগকে বলিয়া কহিয়া নিজের দলে ভর্তি করিয়া লইল। যে দিন কালী স্মরণ করিয়া প্রথম যাত্রা, সেই দিনই হরিদাস গেরেপ্তার। দলের এক প্রাণী ও ধরা পড়িল না, ধরা পড়িল হরিদাস। জেলে গেল হরিদাস।—ফাটকে আটক রহিল হরিদাস।

হরিদাস ফাটকে পড়িলে প্রেমদা আরও বিপন্ন হইল। করে কি, প্রাণবল্লভ বাবুর বাসায় গোপকন্যা পরিচয়ে দাসীবৃত্তি করিতে লাগিল। এখন ও প্রেমদা সেই বৃত্তিতেই আছে।

হরিদাস পুনঃ পুনঃ বলিল, সে নির্দোষ—নিরপরাধী। ডাকাতি সে করে নাই, এক পাই পয়সাও সে ডাকাতি করিয়া পায় নাই, অথচ তাহার ফাটক। হরিদাস অগত্যা পলায়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। সুযোগ মিলিল, হরিদাসও জেল হইতে পলায়ন করিয়া একদমে বর্ধমান গিয়া প্রেমদার সহিত সাক্ষাৎ করিল। জেলা জায়গা, সেখানে অধিক দিন থাকিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাই প্রেমদার পরামর্শে হরিদাস এখন পিসির আশ্রয়ে লুকাইয়া আছে। পিসির নিকট প্রেমদা টাকা পাঠায়, সংসার চলে। মধ্যে মধ্যে একবার দুইবার হরিদাস রাত্রে বর্ধমান যায়; সেখানে দুই তিনদিন গোপনে থাকিয়া—প্রেমদার সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ সম্ভাষণ করিয়া আবার ফিরিয়া আসে। প্রায় সাত আট মাস কাল এই ভাবেই চলিতেছে।

হরিদাস, প্রেমদাকে কুলের বাহির করিয়াছে, ডাকাতের সহায়তা করিয়াছে, প্রাণীহত্যার সহায়তা করিয়াছে, শেষে জেল ভাঙিয়া পলায়ন করিয়াছে—আজিও লুকাইয়া আছে, সে গুরু অপরাধে অপরাধী। পিসি ভ্রূণহত্যা করিয়াছে, জানিয়া শুনিয়া ফেরারি আসামিকে আশ্রয় দিয়াছে, সেও গুরু অপরাধে অপরাধী। ধরিতে পারিব, এ আশা করি নাই। এখন যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিলে বুঝি। বুক পাঁচহাত হইয়াছে।

বেলা যখন দ্বিপ্রহর অতীত, তখন আমরা তারানগরের বাজারে আসিলাম। বাজারের একটু দূরে গাড়ি রাখিয়া—চিড়া দধির সন্ধানে বাজারে প্রবেশ করিলাম। নিজের ঘাড়ে ঝোঁক রাখিয়াই আর কাজ নাই। গেরেপ্তার করি। বাজারের রাস্তা দিয়া থানায় আসিলাম। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া গাড়ির নিকটে আসিয়া দেখি কেহ ত নাই। গাড়িবান বলিল, তাহারা নদীর দিকে গিয়াছে। কতক্ষণ যেন হতবুদ্ধি

হইয়া রহিলাম। থানার লোকও আসিয়া পড়িল, তখনি চারিদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, নিষ্ফল। হরিদাস কি কেবল পিসিকে লইয়াই সরিয়াছে?—আমার ব্যাগটি,—যাহাতে আমার নিজের কাপড় চোপড়, সরকারি কাগজপত্র, হুকুম চিঠি, মায় গোয়েন্দা-পুলিশের চিহ্ন-চাক্‌তি পর্যন্ত ছিল লইয়া গিয়াছে। সকলই ব্যাগের মধ্যে ছিল, ব্যাগটাই গিয়াছে। মাথায় হাত দিয়া বসিলাম।

সেদিন থানাতেই রহিলাম। একটি পয়সাও নাই, গায়ে একটা মাত্র কুর্তি, চাদর পর্যন্ত নাই। দারগাবাবু চাদর দিলেন, হাঁটা-পথে বাসায় আসিলাম।

অবেলায় স্নান আহার করিয়া শরীর অবসন্ন বোধ হইল, একটু বিশ্রাম করিলাম। বৈকালে আমার অনুপস্থিতিকালে যে সকল কাগজপত্র আসিয়াছে, তাহা দেখিতে বসিলাম। সেই সকল কাগজ-পত্রের ভিতর একখানা পত্র পাইলাম। জানিলাম, কাল সন্ধ্যার সময় একটা লোক এই পত্রখানি দিয়া গিয়াছে। চেহারার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, বোধ হইল পত্রবাহক সেই হরিদাস। হরিদাসই পত্র লিখিয়াছে। প্রেমদার সেই পাতকী উপপতি হরিদাসই এ পত্রের লেখক। পত্রে লেখা আছে,—

খাঁ-সাহেব ছালাম জানিবা সেদিন না কহিয়া পলাতক আসিয়াছি ভাবিয়া রাগ করিবা নাই তুমিহ ভালো লোক নহ তোমার বেগের ফাঁক দিয়া আমি তোমার চাপরাশ দেখিয়াছিলাম। যে হোক তুমি কর্লসমবার সর্দার সোময় ধরমপুরের মাঠে মহাব্রহ্ম তলায় অবর্শ অবর্শ আমার সহিত দেখা করিবা অর্নথা না হয় একা না য়াসিলে দিকা হইবেক নাই অধিকন্তুন বিপদে পড়িবা জানিবা ইতি।

বুঝিলাম, আমার তারানগর থানায় আসিবার সময় হরিদাস ব্যাগ

অনুসন্ধান করিয়াছি, ব্যাগের ভিতর গোয়েন্দা-পুলিশের চাপরাশ[৬] দেখিয়াছিল, সেই জন্যই তাহারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। তবে এখন আবার দেখা করিতে চাহে কেন? একা না গেলে হরিদাস যে বিপদ্ ঘটাইতে পারে, এ বিষয়ে আমার অবিশ্বাস নাই, সুতরাং তেমন দস্যুর সম্মুখে একাই বা যাই কি করিয়া? অনেক ভাবনা চিন্তার পর যাওয়াই স্থির করিলাম।

সন্ধ্যার সময় অশ্বারোহণে ধর্মপুরের মাঠের বটতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,—চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, তাহার মধ্যে অন্য আর প্রাণী কেহ নাই। একটু পরেই হরিদাস আসিল। মূল্যবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া হরিদাস বটতলায় আসিয়া দর্শন দিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া সেলাম করিল। বলিল, 'মনে কিছু করিবেন না। সেদিন না বলিয়া চলিয়া না আসিলে আপনি বিপাকে ফেলিতেন। স্ত্রীলোকটিকে পর্যন্ত বিপদে ফেলিতেন। তাও কি হয়?—এখনকার কথা,—আপনি ভদ্রলোক, এ সকল কাজে আপনি কেন? নিরস্ত হোন্। পয়সার দরকার থাকে, বরং কিছু সেলামি গ্রহণ করুন। ধর পাকড়ে কেন যান? ফলই বা তাহাতে পাইবেন কেন?' হরিদাস একটা টাকার তোড়া বাহির করিয়া ঘোড়ার জিনের উপর রাখিল।

'দেখ হরিদাস, আমি তোমাদিগকে বিপাকে ফেলিতাম সত্য, কিন্তু কি করিব, হুকুম। যাহা হউক, আর কাজ নাই। তোমার টাকা তুমি ফিরিয়া লইয়া যাও; কেবল আমার ব্যাগটি দাও। এ মকর্দমার তদন্ত আমি আর করিব না।'

'ব্যাগে আমার প্রয়োজন নাই। কাগজপত্র যাহা যাহা ব্যাগের ভিতর ছিল, তাহা ঠিক তেমনই আছে। সে ব্যাগ আপনি বাসায় বসিয়া পাইবেন; কিন্তু আপনি যে আমাদের প্রতি আর লক্ষ রাখিবেন না

তাহাতে বিশ্বাস?'

'সে বিশ্বাস করা না করার ভার তোমাদের উপর। দেখ হরিদাস তুমি না হয় পলাইয়া বাঁচিলে, কিন্তু প্রেমদার উপায়? সে ভ্রূণহত্যা করিয়াছে, প্রাণবল্লভ সেনের টাকা চুরি করিয়াছে—তাহার ফাটক তুমি কি করিয়া আটকাইবে?'

'ওই ত মশয়, ভয় দেখান আপনাদের অভ্যাস। প্রেমদারই বা আপনারা কি করিবেন? প্রবোধের কপালে ছিল, মেয়াদ খাটিল। তিনমাস মেয়াদ, তাহার আড়াইমাস ত সে খাটিয়াই সারিয়াছে, আর এক পক্ষ মাত্র। প্রেমদাকে ধরিয়া আপনার আর লাভ কি? আর প্রেমদাকে আপনি পাইবেনই বা কোথায়? তাহাকে আমি সরাইয়া দিয়াছি। দুইজন গোয়েন্দা তাহার পিছু লাগিয়াছিল, তাহাদের চক্ষে ধূলা দিয়াছি। প্রেমদাকে আর পাইবেন না। শুনুন বলি, ব্যাগ আপনি শীঘ্রই পাইবেন। আমরা সকলেই এখন কিছুদিন ফেরার থাকিব। যদি ইহার ভিতর আপনি গোলযোগ করেন, বলিয়া যাইতেছি—বিপদে পড়িবেন। তবে আজ আসি—সেলাম।'

লম্ফপ্রদানে হরিদাস ঘোড়ায় উঠিল, তেজি ঘোড়া—হরিদাসকে লইয়া দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে লুকাইয়া গেল। হতবুদ্ধি হইয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসায় আসিলাম। হরিদাস কোথায় যায় —জানিবার জন্য মাঠের প্রান্তে প্রান্তে লোক রাখিয়াছিলাম। তাহারা বলিল, ঘোড়-সওয়ার গ্রামান্তরে যায় নাই—বর্ধমানেই ঢুকিয়াছে। তাহারা আরও বলিল, সওয়ার—লোকটি শ্যামাচরণবাবুর ঘোড়া চুরি করিয়াছে। জানিবার জন্য থানায় লোক পাঠাইলাম, শ্যামাচরণবাবু থানায় সে মর্মে কোনও অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই। নিজেও একবার শ্যামাচরণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। স্বয়ং ঘোড়াটি

দেখিলাম, হাঁ, সেই ঘোড়াই ত বটে। শ্যামাচরণবাবু এখানকার নামজাদা লোক—মান্যগণ্য ব্যক্তি, তিনি কি হরিদাসকে আশ্রয় দিবেন—তেমন ঘৃণিত চরিত্রের পৃষ্ঠবল হইবেন?

এ সব কথা সাহেবকে কিছু বলিলাম না। অনুসন্ধান চলিতেছে, এই পর্যন্ত। তিনি প্রেমদাকে তখনি গেরেপ্তার করিতে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা করিতে দিই নাই, প্রেমদা এখন পলাতক। পরদিন ব্যাগ পাইলাম। সব ঠিক আছে।

প্রেমদাই যে সেন-জায়ার সিন্ধুক হইতে টাকার মোড়ক চুরি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি আসল চিঠি আনিয়া মুখুজ্জে মহাশয়ের হস্তাক্ষরের সহিত মিল করিয়া দেখিলাম, মিলিল। মুখুজ্জে মহাশয় গোপন করিতে পারিলেন না। প্রেমদাই কারসাজি করিয়া যে একটা মোড়ক প্রবোধের কেতাবের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ব্রাহ্মণ তাহা জানিত; প্রেমদার নিষেধ মতে সে কথা বলে নাই। প্রেমদা ত নাই, তবে আর উপায় কি? যে দুই বেচারা তাহার গতিবিধি লক্ষ রাখিবার জন্য নিযুক্ত ছিল, তাহাদের কর্ম গেল। আমারই বুঝিবার দোষে প্রবোধ অনর্থক কষ্ট পাইল, চরিত্রে একটা দাগ লাগিয়া রহিল। কি মনস্তাপ! কোথায় হরিদাস, কোথায় পিসি, কোথায় কি—কিছুই ঠিক নাই; একজনও ধরা পড়িল না; অথচ প্রবোধ কষ্ট পাইল। তখন প্রেমদাকে গেরেপ্তার করিলে আর এত অনুতাপ করিতে হইত না।

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিল, কত মকর্দমার তদন্ত করিলাম, কিন্তু এ মকর্দমার আর কোনও কিনারা করিতে পারিলাম না। কত দেশ ভ্রমণ করিলাম, তাহাদের আর সন্ধান পাইলাম না। ক্রমে ক্রমে মকর্দমাটা এক রকম অচল হইয়া দাঁড়াইল। মনে বড় ব্যথা পাইয়াছি, আমি কিন্তু ভুলিলাম না।

টীকা

১. **বিজক**: লেবেল (Label), গায়ে আটকানো নাম বা বিবরণ লেখা পরিচয়পত্র।

২. **চাকদহ**: নদীয়া জেলাস্থিত, কল্যানী মহকুমার শহর। চলিত নাম চাকদা। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে চাকদহ একটি মিউনিসিপ্যাল এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৩. **রণপা**: রণপা, দ্রুত ছুটে চলার জন্য ব্যবহৃত একজোড়া লম্বা লাঠি। ইংরেজি নাম stilt। বাংলাদেশে সাধারণত ডাকাতরা রণপা ব্যবহার করত বলে জানা যায়। কখনও জমিদারের পাইক বা লেঠেল বা কোনও সৈন্যবাহিনীও ব্যবহার করেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে মধ্যযুগে রণপা-র ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। প্রাচীন গ্রিসে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রণপা ব্যবহৃত হয়ে থাকার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

৪. **কোম্পৌনীর**: কোম্পানির। কোম্পানি অর্থে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সেকালে সরকারি সমস্ত কিছুকেই 'কোম্পানির' বলার চল ছিল। ১৮৫৮-এ কোম্পানির শাসন শেষ হয়ে ব্রিটিশ-রাজ শুরু হয়। কিন্তু তখনও সরকারি বিষয়ে 'কোম্পানি' তকমা চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে।

৫. **কাটোয়া** : বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার সদর শহর। অজয় নদ এবং হুগলি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই শহরের পূর্বনাম কন্টকনগরী। এখানে মুরশিদকুলী খাঁ-র কেল্লা ছিল। মারাঠা বর্গীরা বেশ কয়েকবার হানা দিয়েছে কাটোয়ায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগ্রহণ এই শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৬. **চাপরাশ**: পদসূচক চিহ্নের ফলক বা ধাতব পট্ট। ব্যাজ (Badge)। বাঁকাউল্লা কথিত 'চিহ্ন চাকতি'।

হরিদাস বনাম কৃষ্ণদাস

সিন্দুকের ভিতর মানুষ খুন!

বড় সঙিন মকর্দমা। যে পদাতিক সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, তাহার মুখে ব্যাপারটা আনুপূর্বিক শুনিলাম। নরহত্যার নূতন প্রণালী শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, দেশের লোকের যত বুদ্ধি, সকল বুদ্ধিই এখন নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্কার্য সকলের নব নব পন্থা উদ্ভাবনেই নিযুক্ত হইয়াছে। ব্যাপারটা এই;—

বর্ধমান হইতে কাল্‌না যাইবার পথে—বর্ধমান হইতে কতদূর গিয়া—সাহনগরের বাজার। বাজারের পূর্ব পশ্চিম—প্রায় দুই ক্রোশের মধ্যে আর দ্বিতীয় জনপদ নাই; কেবল মাঠ—পথের পাশে বড় বড় গাছ—আর দূরে দূরে বড় বড় বাগান। বাজারটিও তেমন বড় নয়। —কয়েকখানি মুদির দোকান, একখানি সরাবের দোকান, তিনখানা ময়রার দোকান আর পথিক লোকদিগের থাকিবার জন্য সাত আট চালাঘর। সে সকল ঘর মুদিদেরই বাঁধা—যাহার দোকানের চাল ডাল, তাহারই ঘরে স্থিতি। গতকল্য সন্ধ্যার সময় এক মুদির দোকানে জন কয়েক লোক আসিয়াছিল। ওই সকল লোক রামযাত্রার দলের লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়—রাত্রে তথায় রাঁধাবাড়া করিয়া খাইয়া শুইয়া থাকে। প্রাতে সঙ্গের অপরাপর লোক এখনও আসিয়া পৌঁছিতেছে না কেন—এখানে আসিয়াই সকল একত্র হইবার কথা, তাহারা এখনও একত্র হইতেছে না কেন—এই বলিতে বলিতে কয়েকজন লোক কাল্‌নার দিকে পায়ে পায়ে হাঁটা দেয়, আর জন কয়েক

লোক—তাহারা যায় বর্ধমানে;—যে বাড়িতে বায়না, সেই বাড়িতে আগমন সংবাদ দিতে। তাহারা খোল করতাল সব লইয়া যায়; চটিতে থাকে দুইজন, সঙ্গে থাকে একটা সাজের বাক্স। বাক্সটা আমকাঠের—খুব লম্বাচৌড়া। ইহারা কাল্‌নার দিকের লোকদিগের জন্য সেই চটিতে বসিয়াই অপেক্ষা করিতে থাকে।

বসিয়া আছে ত বসিয়া আছে, মুদি লোক দুটির প্রতি তত লক্ষ রাখে নাই। কখন যে ওই দুইজন লোক চলিয়া গিয়াছে, মুদি তাহা জানে না। কত লোক যাইতেছে আসিতেছে, তামাকু খাইতেছে আবার চলিয়া যাইতেছে, মুদি তাহা কি করিয়া ঠিক রাখিবে? এ লোক দুজন ছিল, সেই যাত্রীর চালা ঘরে। বেলা হইল, যে দুজন আছে তাহারা পাকশাক করিবে কিনা জানিবার জন্য মুদি সেই চালায় গিয়া দেখে, তাহারা ত নাই। সাজের বাক্স ফেলিয়া তাহারা গেল কোথায়? ওই ত বাজার, তৎক্ষণাৎ কথাটা রাষ্ট্র হইল, অনুসন্ধান হইল, লোক মিলিল না। লোকেরা সাজের বাক্স ফেলিয়া গেল কেন? মুদি বড় দুর্ভাবনায় পড়িল।

যাত্রাদলের যাত্রাওয়ালারা চলিয়া গিয়াছে, অথচ সাজ পড়িয়া আছে। যাহাদের হাতে বেচাকেনা ছিল না, তাহারা দেখিতে আসিল। দেখিতে দেখিতে মুদির সেই চালাঘরে—সাজের সিন্দুকের চারিধারে বিশ পঁচিশ জন লোক দাঁড়াইয়া গেল। সকলেই বলিল, দুর্গন্ধ। সকলেই বেশ অনুভব করিল, সিন্দুকে বড় দুর্গন্ধ। সাজের সিন্দুক, তাহাতে এত দুর্গন্ধ কেন? সকলেই কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

একজন দেখিল, সিন্দুকের নীচে বড় বড় ডেঞে পিপ্‌ড়ের সারি। সাদা সাদা কি একটা বস্তু—তাহারা মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। কেহ

বলিল, 'হইতে পারে। কল্য যেখানে গীত হইয়াছিল, সেইখানে যাত্রাওয়ালারা যে সব পক্কান্ন পাইয়াছিল, সেই সকল লুকাইয়া রাখিয়াছে। পক্কান্ন মিঠাই চুরি করা যাত্রাওয়ালাদের অভ্যাস।' কেহ বলিল, 'যাত্রাওয়ালার পোষাক—আজন্ম রজকের পাট দেখে নাই, কাজেই দুর্গন্ধ।' যাহাই হোক, সিন্দুকটা এখন দোকানির গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইল। পরের সিন্দুক যে কোথায় রাখিবে?—যদি খোয়া যায়—কে তাহার দায়ী হইবে? বৃদ্ধ দোকানি ফাঁড়িতে খবর দিল।

ফাঁড়িদার মাল জিম্মা লইবার জন্য সাহনগরের বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলেন; সিন্দুকে কি কি মালামাল আছে ফিরিস্তিবন্দি করিবার জন্য সর্বসমক্ষে সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিয়াই অবাক। একি! এ ত সাজের সিন্দুক নয়—এ যে মাথাকাটা একটা শব। এই শব দেখিয়াই ফাঁড়িদার আমাকে সাহায্যার্থে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ পদাতিকের সহিত যাত্রা করিলাম।

গিয়া দেখি, বাজারে লোক ধরিতেছে না। স্থানীয় পুলিশ চৌকি-দারও অনেকে আসিয়া জুটিয়াছে। সন্দেহ শোভে করিয়া আসামিও দুই তিনটি ধরা পড়িয়াছে—তাহারা হাতকড়ি পরিয়া পুলিশ হেপাজতে আছে। দোকানিও বাঁধা পড়িয়াছে। একদিকে লাশ শনাক্তর চেষ্টা হইতেছে, অন্যদিকে যাত্রাওয়ালা ধরিতেও দুই দিকে লোক গিয়াছে। তদন্তের পূর্বাহ্নিক ক্রিয়া প্রায় সমাধা হইয়া গিয়াছে।

লাশ দেখিলাম। ভদ্রলোক। পরিধানে পরিষ্কার ধুতি, গায়ে বুক আঁটা মেরজাই[১], কোমরে উপবীত, পায়ে ঘোরতোলা বিনামা[২]। গলা এক কোপে কাটা নয়—তিন চারি আঘাতে থেঁতো ধরনের কাটা। শরীরের অন্য কুত্রাপি কোনও আঘাতের চিহ্ন নাই। হতব্যক্তি যুবাপুরুষ। অনুমান করিলাম, বয়স ত্রিশের ভিতর। শবদেহের মাথা

নাই, মস্তকশূন্য দেহ, সহসা কেহ শনাক্ত করিতে পারিতেছে না। দেখিয়া শুনিয়া দোকানে আসিয়া বসিলাম। অপরাহ্নের আর বিলম্ব নাই।

কত লোক আসিতেছে, দাঁড়াইতেছে, লাশ দেখিয়া ব্যাপার শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। আগন্তুকদের দিকে আমার দৃষ্টি আছে। সন্ধ্যা হয় হয়—ঠিক এমন সময় সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ ছাপা, মাথায় টিকি, ভুঁড়িদার এক গোস্বামী প্রভু—সঙ্গে ততোধিক অঙ্কিতবপুঃ তদপেক্ষা দীর্ঘ টিকিওয়ালা বহির্বাসপরিহিত তল্পিদার দোকানের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। গোস্বামী প্রভু শিরোহীন শবদেহের দিকে চাহিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'কৃষ্ণদাস ক্ষণতিষ্ঠ। উঃ—কি দুর্দৈব! ব্যাপারটা শ্রবণ করি।' তল্পিদার তল্পি নামাইতে নামাইতে আর নামাইল না। একটু অন্তরালে গিয়া তল্পি নামাইল—তল্পি নামাইয়া বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল। বেশ চেনা লোক, পশ্চাৎ দেখিয়াই সম্মুখের আভাস মনে পড়িল! ছুটিয়া গিয়া কৃষ্ণদাসের সম্মুখে দাঁড়াইলাম, বলিলাম— 'তুমি না হরিদাস?'

হরিদাস শিহরিয়া উঠিল! থতমত খাইয়া যেন কেমনতর হইয়া পড়িল। উত্তর দিতে পারিল না। দ্রুতগতি প্রভু আসিলেন। বলিলেন, 'কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং। আমার পৈত্রিক শিষ্য, সাতপুরুষ ধরিয়া উহারা কৃষ্ণদাস, আপনি বলেন হরিদাস? কে হরিদাস—কোথাকার হরিদাস? চল কৃষ্ণদাস, আর বেলা নাই, অদ্যই আমাদের বর্ধমানে পৌঁছিতে হইবে।'

হরিদাস তল্পি তুলিল। তল্পি ধরিয়া সজোরে বসাইলাম। দুইজন পদাতিককে বলিলাম, 'গুরু-শিষ্য—এক হাতকড়িতে বাঁধ।' তৎক্ষণাৎ বন্ধন।

প্রভুর গম্ভীর বদন—তথা শাস্ত্রবাক্যপূর্ণ বক্তৃতা, শিষ্যের একান্ত বিনয় এবং অপরাধ অপ্রমাণের জন্য কৃষ্ণদাস বলিয়াই প্রমাণের যত্ন দেখিয়া সকলেই বলিল, আমি ভ্রমে পড়িয়াছি। ভ্রমে পড়িয়া গুরু শিষ্যকে কষ্ট দিতেছি—মানী লোকের মানহানি করিতেছি। সকল লোকেরই বিশ্বাস, আমার ভ্রম। লোকটা নিতান্তই যেন কৃষ্ণদাস। কেমন বিস্মৃতি আসিয়া দাঁড়াইল; বেশ জানি হরিদাস, তথাপি সন্দেহ হইতে লাগিল। ভ্রমভঞ্জনই কর্তব্য বলিয়া ধরিলাম। এ মকর্দমার যতদূর অনুসন্ধান হয় ফাঁড়িদার করুন, গোস্বামী প্রভুও এখানে নজরবন্দি থাকুক, কৃষ্ণদাসকে লইয়া আমি একবার নবদ্বীপ ঘুরিয়া আসি। নবদ্বীপের বাসেন্দা, কৃষ্ণদাসের অবশ্যই ঘর আছে, পাড়ার দশজন প্রতিবেশীও আছে। কৃষ্ণদাসকে যাচাই করা সুতরাং নিতান্ত কষ্টসাধ্য নয়। পরদিন দুইজন অনুচর ও কৃষ্ণদাসকে লইয়া নবদ্বীপে চলিলাম।

রাত্রি এক প্রহরের সময় নবদ্বীপ পৌঁছিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজির আখড়ায় বাসা লইয়া প্রাতে অনুসন্ধান লইব, এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেই কৃষ্ণদাস বলিল, 'তাও কি হয়? বিপদে পড়িয়াছি বলিয়াই কি আমার ঘরবাড়ি নাই? এ নবদ্বীপে আমাকে না চিনে কে? চলুন বাড়ি যাই। আহার করিয়া—বিশ্রাম করিবেন, কাল প্রাতে যেমন প্রমাণ চান, আমি তাহাই দিব।'

তাহাই হইল। কৃষ্ণদাসের বাড়িতেই চলিলাম। সে বাড়ি নবদ্বীপের কোন্ পাড়ায়, রাত্রিকাল—চিনিতে পারিলাম না। একটা প্রাচীর আঁটা বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণদাস 'মামা—মামাগো' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। দুই তিন ডাকের পর মামা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। হাসিয়া বলিল, 'কৃষ্ণদাস?—সঙ্গে এ সব কারা? এত রাত্রে কুটুম্ব সঙ্গে, কারণটা কি? প্রভু কোথায়।'

কৃষ্ণদাস উত্তর দিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। আমরাও চলিলাম। মামা দক্ষিণদ্বারী ঘরের দাওয়ায় কম্বল বিছাইয়া দিল, বসিলাম। পাকশাকের আয়োজন হইতে লাগিল। হরিদাস বসিয়া বসিয়া নিজের অকারণ গেরেপ্তারের কথা মামাকে বলিতে লাগিল। 'কৃষ্ণদাস যে কেমন বাপের ব্যাটা কাল সকালেই সে পরিচয় পাইবেন।' কৃষ্ণদাসের হাতে তখনও হাতকড়ি।

অনুচরেরা দধি চিড়া ফলাহার করিল, আমি অন্নই খাইলাম। সেই দাওয়াতেই বিছানা।—একদিকে আমি, অন্যদিকে কৃষ্ণদাস ও অনুচর দুজন; তাহারা প্রহরে প্রহরে বদলি হইয়া কৃষ্ণদাসকে পাহারা দিবে। এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া শয়ন করিলাম;—তৎক্ষণাৎ সুনিদ্রা।

উঠিয়াই দেখি, আমি বালির শয্যায়,—সম্মুখে দেখি গঙ্গা, দূরে দেখি বন-ঝাউ গাছের ঘন বনের সারি। নিকটে জন প্রাণীও নাই। একাকী আমি এই শ্মশান শয্যায়। কতক্ষণ যেন ঘটনাটা ভাল বুঝিতেই পারিলাম না। সেই বালিচরে বসিয়াই কতক্ষণ ভাবিলাম। নিকটের এক ঝাউবনের অন্তরাল হইতে একটি লোক আমার দিকে আসিতেছে, দেখিলাম। সেইইত। কৃষ্ণদাস হরিদাসই ত। সর্বাঙ্গে এখন আর সে সব ছাপ ছাপা নাই, বহির্বাস কৌপীন নাই, টিকিটি পর্যন্ত নাই; বেশ চিনিলাম, এত হরিদাস। হরিদাস হাসিতে হাসিতে বলিল, 'খাঁ সাহেব ছেলাম। রাগ করিবেন না। হরি কৃষ্ণে কি ভেদাভেদ আছে? প্রভুকে গিয়াই ছাড়িয়া দিবেন। কৃষ্ণদাস বলিয়াই আমাকে জানিবেন। আমি আর হরিদাস নহি। প্রভুকে ছাড়িয়া না দিলে হয়ত আপনাকে বিপদে পড়িতে হইবে।' হরিদাস গম্ভীরভাবে অদূরে দাঁড়াইয়া এই উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল। ধরিতে সাহস করিলাম না। দেখিতে দেখিতে সে কোথায় গেল, আর দেখিতে

পাইলাম না। থানায় আসিয়া নবদ্বীপ তটস্থ করিয়া তুলিলাম, বৈষ্ণব বৈষ্ণবীতে থানা পূর্ণ করিয়া ফেলিলাম, মামাকে দেখিলাম না। সে হরিদাসকে কেহ চিনিল না। একপাল হরিদাস, কৃষ্ণদাস, তাহার মধ্যে সে কৃষ্ণদাসকে পাইলাম না। অনুচর দুটি—তাদেরও সন্ধান পাইলাম না। দারুণ মনস্তাপে অধীর হইয়া উঠিলাম। অনাহারেই বর্ধমানের দিকে হাঁটা দিলাম।

আসিয়াই সংবাদ পাইলাম, প্রভু নাই! যে পদাতিকের জিম্মায় প্রভু ছিলেন, তাহার চাকরি গিয়াছে, কিন্তু প্রভুর আর কোনও অনুসন্ধান হয় নাই। তল্পি ফেলিয়াই প্রভু পলাইয়াছেন, তল্পি পুলিশের জিম্মায় আছে। তল্পি দেখিলাম। কুশাসন, গাড়ু, খড়ম, হরিনামাবলী, খুন্তি, কয়েকখানা পুঁথি আর দুই তিনখানি কাপড় তল্পিতে আছে। পুঁথিগুলি খুলিলাম। সংস্কৃত জানি না, কি পুঁথি বুঝিতে পারিলাম না। পুঁথির ভাঁজে ভাঁজে অনেকগুলি রোকা চিঠি। তাহার একখানা রোকায় লেখা আছে;—

সেদিন আমার মনের ভাব শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া আসিয়াছি; সে এখনও আমার তখনও আমার, কেবল হারাণের তাড়নায় সে আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিতে পায় না। আমি তাহার জন্য ফকিরি লইতে পারি, সুতরাং বিষয়ের কথা আর কি বলিব, আমার যথাসর্বস্ব লইয়া তারিণীকে আমার কাছে আনিয়া দিন। হারাণের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করুন; সধবা অপেক্ষা বিধবা হইলে সে অধিক সুখী হইবে সন্দেহ নাই, অদ্য যাহা পাঠাই লইবেন। এবং কার্য শেষ করিলে বাকি প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ পাঠাইব দ্বিধা ভাবিবেন না আমি আপনার পদাশ্রিত জানিবেন নিবেদন ইতি—

শ্রীব্যোমকেশ

স্পষ্টই বুঝিলাম, খুনোখুনির কথা। প্রভু টাকা লইয়া লোকের সর্বনাশ করিয়া থাকেন। সাহনগরের বাজারে যাহার মস্তকহীন দেহ পাওয়া গিয়াছে, সে ত হারাণ নয়? এ মীমাংসা বড় কঠিন। এখন করি কি?

আর একবার নবদ্বীপটা দেখিব। নবদ্বীপে তেমন কায়েম বাড়ি, অন্ততঃ মামাকে পাইবই পাইব। সে দিনকার সদ্যসদ্য অনুসন্ধান, সেই জন্যই হয় ত হয় নাই। ফল যত হয় না হয়, একবার দেখা চাই। ধুলট° আসিতেছে;—এই ধুলটের সময়েই অনুসন্ধান ভাল হইবে। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া ধুলটের পূর্বদিনে নবদ্বীপে আসিলাম। থাকিলাম, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদাস বাবাজির আখ্‌ড়ায়।

কথায় কথায় বাবাজিকে মামার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। একটু চিন্তা করিয়া বাবাজি বলিলেন, 'চিনি। নাম তাহার নবীন দাস। কৃপানন্দ ঠাকুরের সে চেলা। তেমন বদ লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হইল কিরূপে? তাহারা চোর? আশ্রিত যাত্রীর টাকাকড়ি পর্যন্ত তাহারা কাড়িয়া লয়।—কাড়িয়া লইবার জন্যই ঠাকুরের চেলারা নিযুক্ত আছে। তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ?'

'আলাপ আছে। প্রভুশিষ্য—উভয়ের সঙ্গেই আলাপ আছে সে আলাপ যে কেমন আলাপ, তাহা এখন বলিব না; আপনি তাহার বাড়িটি একবার দেখাইয়া দিতে পারেন? বড় উপকার হয়।' বাবাজি বলিলেন 'পারি'। সন্ধ্যার পরই যাওয়া যাইবে স্থির রহিল। বৈকালে থানায় গেলাম। চারিজন বলিষ্ঠ পদাতিক, যাত্রীর বেশে আমার অনুযাত্রীরূপে লইলাম। আমরা পাঁচজন আর বাবাজি, ছয়জনে নবীন দাসের দরজায় গিয়া হাজির হইলাম। বাবাজিই ডাকিলেন, নবীন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দেখিয়াই চিনিলাম, মামা। মামা আমাকে দেখিয়াই যেন এটকু অপ্রতিভ হইল, কি বলিতে যাইতেছিল, পারিল

না। ইত্যবসরে দেখিলাম, প্রভু বসিয়া আছেন। ইসারা করিতেই পদাতিকেরা মামা ও প্রভুকে বাঁধিল। বাজে যাত্রীদের তখনি বাহির করিয়া দিয়া বাড়ি অনুসন্ধান করিলাম। চারিদিকে সোরগোল হইয়া পড়িল। রাঁধিতেছিল পিসি। পিসি উঁকি দিতেই চিনিলাম, পিসিও বাঁধা পড়িল। ভাগ্য, হরিদাসও ঘরের ভিতর ছিল। সে বেগতিক দেখিয়া ভোঁ দৌড় দিল, পদাতিকেরাও ছুটিল। কৃতকার্য হইল। মামা, প্রভু, পিসি ও হরিদাস; আসামি চারিজনকে সে রাত্রি থানায় রাখিয়া পরদিন চালান দিলাম।

প্রভু ভয়ানক কঠিন লোক। ফাঁসি কবুল, তথাপি ব্যোমকেশের পরিচয় দিবেন না। দুই বেলাই জিজ্ঞাসা করি, প্রভু হাসিয়া বলেন 'রাধে রাধে, সে কথাও কি বলে?' পিসিও ঘাগী। পিসি হাজতের উঠান কাঁদিয়া কাদা করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু প্রেমদার সন্ধান বলে নাই। এখনি খালাস দিব, যেখানকার পিসি, সেইখানে রাখিয়া আসিব, কিছু নগদও দিব, পিসি সে দিক দিয়া যায় না।

হরিদাসের পাঁচহাত বুক এতটুকু হইয়া গিয়াছে। সাহস এখন আর কিছুমাত্র নাই। সর্বদাই সে যেন কি ভাবে।

একদিন হরিদাস বলিল, 'খোদার কসম্ খাঁ—সাহেব; আমাদের কি রকম সাজা হইবে বলতে পারেন?'

'পারি, কিন্তু তুমি সে কথায় বিশ্বাস করিবে কেন?'

'করিব। দিলেশাকে[৪] আমি বড় ডরাই। দিলেশা দিয়াছি, আর এহন অবিশ্বাস করিব কেন?'

'দেখ হরিদাস, চুরি জুয়াচুরি, ডাকাতি; এ সকলই তোমার ঘাড়ে চাপিয়াছে। দশ পনের বৎসর সেজন্য মেয়াদ হইবার সম্ভাবনা। আর যদি ইহার ভিতর প্রেমদাকে ধরিতে পারি, তাহা হইলে তুমি ভ্রূণ-

হত্যাকারিণীর ভ্রূণহত্যায়[৫] সহায়তা করিয়াছ বলিয়া আসামি হইবে। ভ্রূণহত্যা মাত্র, সে ত বড়মানুষ হত্যার ন্যায় কঠিন নয়; তাহা হইলে আর ফাঁসি হইবে না। তোমাদের উভয়েরই দ্বীপান্তর হইবে।'

'দ্বীপান্তর কেমন?'

'ঠিক এই দেশেরই মত, কেবল দেশান্তর মাত্র। এদেশের কোনও লোকের আজীবন পশ্চিমবাসও যেমন, দ্বীপান্তরবাসও তেমনি।'

'সেখানে নাকি কোম্পানি বাহাদুর খরচায় মেয়ে-পুরুষের বিয়ে দেয়?'

'বাপে যেমন ছেলেমেয়ের বিবাহ দেন, তাহাদিগের চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া দেন, কোম্পানি বাহাদুর ঠিক তেমনই ব্যবহার করেন।'

হরিদাস কতক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, শেষে বলিল; 'মেয়াদ বড় কষ্টকর। আর সে দীর্ঘ মেয়াদ। যদি প্রেমদাকে আমার সঙ্গে দ্বীপান্তর পাঠায়—সেইখানে দুজনের বিবাহ দেয়—এক সঙ্গে ঘরসংসার করিতে পাওয়া যায়, তবে দেশান্তরই বা কি আর দ্বীপান্তরই বা কি?'

সম্মতি ও সহানুভূতি জানাইয়া বলিলাম, 'তাহাতে আর সন্দেহ কি? দুজনে যেমন প্রণয়, সেখানে বেশ স্ত্রীপুরুষের মত থাকিবে। কত লোকজন, বাজার হাট, কিছু মাত্র কষ্ট নাই।'

'তবে সেই উপকারই করুন। মরণকালে গঙ্গার দিকে পা। মরিতেই ত বসিয়াছি, তবে আর একা মরি কেন? যাহা হয়, দুজনের ভাগ্যেই হউক; দুজনে একত্রে থাকিতে পাইলেই হইল। যাহাতে আল্লার দিলেশা, খোদার কসম, দুজনেরই একসঙ্গে দ্বীপান্তর হয়, তাহাই আপনি করুন।'

'তাহা আমি পারি। কিন্তু দেখ হরিদাস, মন খুলিয়া সব কথা বলিতে হইবে। নতুবা আমি এক রকম বলিব, তুমি অন্য রকম বলিবে, তাহা হইলে সবই নিষ্ফল।'

'সমস্ত বলিব। আপনাকে যখন বিশ্বাস করিয়াছি, ধর্মভার দিয়াছি; —তখন সবই বলিব। যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, করুন; বলিব।'

জানি, হরিদাস গাঁজা খায়। উপদেশই ছিল; অছিলা। উঠিয়া আসিলাম—একজন আরদালি সেই অবসরে হরিদাসকে গাঁজা খাওয়াইয়া আসিল। আবার গারদে ঢুকিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম 'যাহার সহিত একসঙ্গে দ্বীপান্তর যাইবে, সে কোথায়? তাহাকে ত চাই।'

'সে বর্ধমানেই আছে। শ্যামাচরণ বাবুর অন্দরে আছে। আপনি কি তাহার সন্ধান পাইবেন?' হরিদাস আপন মনে একটু ভাবিল; বলিল, 'এক কাজ করুন। আমাকে লইয়া চলুন। তিনজনে এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সেইরূপ এজেহার দিব।' তাহাই স্থির করিলাম। পরদিন হরিদাসকে খুব সাবধানে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সঙ্গে আরও লোক চলিল।

হরিদাস, শ্যামাচরণ বাবুর একটি চাকরকে ডাকিয়া চুপি চুপি কি বলিল; একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া সে কি বলিল;—হরিদাস বলিল, 'আসুন মহাশয়, প্রেমদা চৌরাস্তার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে।'

চৌরাস্তায় আসিয়া দেখিলাম; প্রেমদা। একখানা গাড়ি করিয়া তিন জনেই সেই গাড়িতে উঠিলাম। পদাতিকেরা সশস্ত্রে চারিদিক ঘিরিয়া চলিল। আমাকে কিছুই বলিতে হইল না; হরিদাসই দ্বীপান্তর মাহাত্ম্য বলিয়া প্রেমদাকে সম্মত করিল। দুজনেই একমত হইয়া বলিল, দ্বীপান্তরই ভাল।

'হরিদাস, তুমি এখন যে সকল অপরাধে অপরাধী, দ্বীপান্তরের শাস্তি তাহাতে কুলাইবে না। বরং তুমি সত্য সত্য যে সকল কাজ করিয়াছ, সে সবগুলি একত্র করিলে হইতে পারে। তোমার নামে ডাকাতি, জেলভাঙা, কুলকন্যাকে ঘরের বাহির করণ, গর্ভপাত

করিবার সাহায্য করণ, চুরি প্রভৃতি যে অপরাধ আছে, তাহাতে পনের বৎসর মেয়াদ হইবে। এই আইনই দেখ না কেন? হাকিমেরা ত আইনের বাধ্য।' জামার জেবে একখানা বাঁধা খাতা ছিল, তাহাই আইন পরিচয়ে খুলিয়া পড়িলাম, 'চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গর্ভপাত প্রভৃতির একটি বা সকল কয়েকটি অপরাধ কেহ করিলে, তাহার পনের বৎসরের অনধিক কাল কারাদণ্ড অথবা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে। আর যদি তৎসহ অপরাধযুক্ত নরহত্যা থাকে, তবে নরহত্যার জন্য ফাঁসি হইবে না, তৎপরিবর্তে দ্বীপান্তর হইবে। এই আইন।' হরিদাস কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'দেখ, বিশ্বাস করিয়াছ বলিয়াই বলিতেছি, আমি শুনিয়াছি। স্বয়ং প্রভুর মুখে শুনিয়াছি—তুমি নরহত্যা করিয়াছ।'

'করিয়াছি! যদি সে কথা বলিলে ফাঁসির বদলে প্রেমদার সহিত একত্র দ্বীপান্তরবাস ঘটে, ত সত্য কথাই বলিতেছি। শঙ্করপুরের হারাণ রায়কে আমি খুন করিয়াছি। তবে আমি একা ছিলাম না;—ছিদেম, কালু, রামশঙ্কর আর মেঘাই ছিল। তাহারাও মারিয়াছিল।'

'কেন মারিয়াছিল?'

'ওই গ্রামের ব্যোমকেশ গাঙ্গুলীর সহিত হারাণ রায়ের স্ত্রীর প্রসক্তি ছিল। ছুঁড়ির নিতান্ত ইচ্ছা, মিন্সে মরিয়া গেলে তাহার ধনে চিরদিন ব্যোমকেশের সহিত সুখেস্বচ্ছন্দে থাকে। ব্যোমকেশ প্রভুকে খরচা দিয়া হারাণকে খুন করাইয়াছিল।'

'এই জবাবেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন প্রেমদার কথা। প্রেমদা ভ্রূণহত্যা করিয়াছে, টাকা চুরি করিয়াছে; সেই অপরাধই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। আইনের বলে, স্ত্রীলোক যদি গর্ভপাত করে এবং চুরির অপরাধ করে, তবে তাহার দ্বীপান্তর হইবে। প্রেমদার পক্ষে এই

যথেষ্ট; কিন্তু পিসিকে ত চাই? পিসিই ত ভ্রূণহত্যার সাক্ষী; তাহাকে ত চাই?'

প্রেমদা বলিল, 'পিসি নিকটেই আছে। তাহাকে ডাকিলেই আসিবে। যাহা বলিতে বলিব, সে তাহাই বলিবে।' প্রেমদা ও হরিদাসকে সে দিন একই ঘরে রাখা গেল।

প্রভুকে বলিলাম, 'সব খবর আমি পাইয়াছি। ব্যোমকেশকে জানি। শঙ্করপুরের হারাণ রায়কেও চিনি। ব্যোমকেশকে গেরেপ্তার করিয়াও আনিয়াছি। সে সমস্তই কবুল করিয়াছে।'

'তা করুক; আমি কিছুই জানি না।' বুঝিলাম প্রভু সহসা কবুল করিবেন না।

ব্যোমকেশকে পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। স্থানীয় পুলিশ তাহাকে গেরেপ্তার করিয়া পাঠাইলেন। পিসিকেও পাওয়া গেল। কেবল পাওয়া গেল না, ছিদেম প্রভৃতি চারিজনকে। তাহারা এখন যে কোথায়, হরিদাসেরা তাহা জানে না।

বিচারে এক পক্ষ লাগিল। প্রভু, পিসি, ব্যোমকেশ, প্রেমদা ও হরিদাস; আসামি শ্রেণীতে এই পাঁচজন। একপ্রাণীও খালাস পাইল না। হরিদাসের বাসনা পূরিল, কিন্তু প্রেমদার পূরিল না। হরিদাস দ্বীপান্তরে গেল, প্রেমদা গেল না। তাহার দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড হইল।

টীকা

১. **মেরজাই**: ফতুয়া-জাতীয় জামা। ফারসি 'মিরজাই' শব্দ থেকে উদ্ভূত।

২. **ঘোরতোলা বিনামা**: বিনামা শব্দের অর্থ জুতো বা পাদুকা। যে-জুতোর চারদিক ঘেরা এবং উঁচু, তাই হল ঘোরতোলা বিনামা। অর্থাৎ বুটজুতো বা তদ্‌শ জুতো।

৩. **ধুলট**: বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেলা বা উৎসব। নাম সংকীর্তনের পর ধুলো মাখামাখি বা ধুলোয় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসবকে ধুলট বলা হয়। নবদ্বীপের ধুলট মেলা মহাসমারোহে পালিত হত। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীর দিন শুরু হয়ে বারো দিন ধরে এই মেলা চলে। বাংলার প্রায় সকল কীর্তনীয়া এই ধুলট মেলায় হাজির হন।

৪. **দিলেশা**: দিলাশা। অর্থ সান্ত্বনা।

৫. **ভ্রূণহত্যা**: ভারতে ভ্রূণ হত্যা আইনানুগ ঘোষণা করে আইন পাশ হয়েছে ১৯৭১ সালে। তার আগে পর্যন্ত এই অপরাধে ভ্রূণহত্যাকারীর তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং জরিমানা, এবং যে গর্ভবতী নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করা হত তার সাত বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং জরিমানার শাস্তি ধার্য ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে। কিন্তু গর্ভবতী নারীর প্রাণসংশয় দূর করতে ভ্রূণহত্যা করা হলে তা মার্জনা করার বিধান ছিল সেই আইনে। ইংল্যাণ্ডে ১৯৬৭ সালে ভ্রূণ হত্যা আইনের স্বীকৃতি পায়। অবশ্য ১৯৭১ সালে প্রণীত মেডিক্যাল টারমিনেশন অব প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট অনুসারে সব ধরনের ভ্রূণহত্যাই যে আইনস্বীকৃত, তাও বলা চলে না। বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই শুধুমাত্র গর্ভপাত ঘটাতে পারেন।

বহুরূপী

চেহারা জাল!—আকার জাল॥—মানুষ জাল॥

চাকরি করিবার সময় আমি কৃষ্ণনগরেই[১] অনেক দিন ছিলাম। বাসা ছিল চাঁদসড়কে[২]। আমাদের বাসার নিকটেই তারণ তাঁতির বাস। তাঁতি নাই; একটি সতের আঠার বৎসর বয়সের পুত্র আর পঁচিশ বৎসরের এক বিধবা কন্যা স্ত্রীর গলায় রাখিয়া তারণ পরলোকে গমন করিয়াছে; সোনার সংসার কষ্টের সংসার হইয়াছে। তারণ, পুত্রকে দিনকতক পড়িতেও দিয়াছিল, ছেলেটি মানুষ হয় নাই। গোপাল সারাদিনই এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়,—গায়ে সামর্থ্য আছে—গুণ্ডামি-ষণ্ডামি করে; নেশা ভাং করিতেও শিখিয়াছে। থাকেও এক মাগির আটচালায়। গোপাল উপার্জন করে না, বরং মধ্যে মধ্যে বাড়ি আসিয়া উপদ্রব করে, যাহা পায় লইয়া যায়, —কিছু দিন দেখাই দেয় না। গোপাল আমাকে বড় মান্য করে, উপদ্রবকালে আমার নাম করিলে সে ক্ষান্ত হয়। দেখা হইলে, তাহাকে দুই একটি উপদেশ দি। বুড়া মা, বিধবা ভগ্নী গলায়; প্রতিপালন করিবার উপায় অবলম্বন করিতে বলি।—গোপাল একটু নরম হয়। বাসায় আসিলেই সকলের আগে গোপালদের সংবাদ লই। চলাচলের কথা জিজ্ঞাসা করি। গোপাল দাদা বলিয়া ডাকে, সে সূত্রে আত্মীয়তাও জন্মিয়াছে।

সে দিন তদন্ত হইতে বাসায় ফিরিয়া গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রায় তিনমাস ছিলাম না; দীর্ঘকালের সরেওয়ার[৩] সংবাদ

লইবার জন্য গোপালের বিধবাভগ্নী সুখময়ীকে ডাকিলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আজ তিনমাস তাহার সংবাদ নাই। সে যে কোথায় গিয়াছে, কেহ জানে না! মা সেই হইতেই অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে।' ভাল হউক মন্দ হউক—পুত্র ত বটে। অন্নজল ত্যাগ করিবারই কথা; কিন্তু সুখী এ বলে কি? তিনমাস গোপাল এখানে নাই? হতভাগা তবে গেল কোথায়?

সুখময়ী বলিল, 'দাদা, তুমি ত কোম্পানির লোক, তুমি আমার ভাইটিকে আনিয়া দাও। তুমি মনে না করিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে না।'

আমি কোথায় পাইব? তথাপি তাহাকে প্রবোধ দিয়া বিদায় করিলাম। বাস্তবিকই ছোঁড়া তবে গেল কোথায়? চিন্তিত রহিলাম।

সহরে গিয়াছিলাম। সহর মুরশিদাবাদে[৪] গিয়াছিলাম। বড় সাহেব[৫] আসিয়াছিলেন, ঠগী ও ডাকাতি নিবারণ জন্য গোপনে প্রকাশ্যে যে সকল পুলিশ নিযুক্ত আছে, বড় সাহেবকে সেলাম দিবার জন্য তাহারা সহরে একত্র হইয়াছিল, আমিও গিয়াছিলাম, সাত আট দিন ছিলাম।

খাগড়া[৬] হইতে সওদাবাদ[৭] যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া একদিন খাগড়া হইতে সওদাবাদের দিকে যাইতেছি; সম্মুখেই দেখি গোপাল! গোপালের সঙ্গে আরও তিন চারটি লোক। বহুদিনের চেনা পরিচয়, আমাকে দেখিয়াই গোপাল মুখ ফিরাইল। মুখ ফিরাইতেই গোপালের সঙ্গীরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া একটু দ্রুতপদে চলিল। আমি ডাকিলাম, 'গোপাল'—গোপাল উত্তর দিল না, আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। আমিও দ্রুতপদে চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, গোপাল বাড়ি হইতে পলাইল কেন?—আমাকে দেখিয়াই

বা কথা কহিল না কেন? কুকার্য করিয়াছে, না বলিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছে—হঠাৎ আমার সম্মুখে পড়িয়া হয় ত বড় লজ্জিত হইয়া পাড়িয়াছে। লজ্জার খাতিরে কথা কহিতে পারে নাই। যাহা হউক, ধরিতে হইবে। হতভাগাকে বাড়ি লইয়া যাইতে হইবে। প্রাণপণে গোপালের অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

সঙ্গীরা চলিতেছে। চলিতে চলিতে পেছন ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে, আবার চলিতেছে। ইহারা কতদূর যাইবে? সওদাবাদ ছাড়াইলাম। সন্ধ্যা হয়—আর বিলম্ব নাই; আর কতদূর যাইব? বাসা ছাড়িয়া প্রায় তিন ক্রোশ পথ আসিয়াছি, আর কতদূর যাইব? পথিক লোকের সঙ্গে বাসাড়েলোক আমি—কতদূর যাইব? ভাবিতেছি, কিন্তু চলিতেছি! কোনও পক্ষেরই হাঁটার বিরাম নাই। অবিরাম গতিতেই চলিয়াছি।

নশীপুরের ভিতর আসিয়া সঙ্গীসহ গোপাল হারাইয়া গেল। চারিক্রোশ আন্দাজ পথ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এতক্ষণে লক্ষ্য ব্যর্থ হইল; পাইলাম না। সেই পাড়ায় কোনও রাহী লোকজন আসিয়াছে কিনা অনুসন্ধান লইতে লাগিলাম; এক ময়রা বলিল, 'আসিয়াছেন। বিরাজবাবুর পোড়ো বাড়িতে একজন বাবু আসিয়াছেন। ছেলেপুলে লোকলস্কর সব সঙ্গে আছে। এই যে নিকট—একটা মোড় ঘুরিলেই বামদিকে বড় দোতালা।'

রাত্রি হইয়াছে। তত রাত্রে গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করা ভাল বলিয়া বুঝিলাম না, ময়রার দোকানে রাত্রিবাস করিলাম। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখা করিলাম। বরাবর উপরে গিয়া গোপালকে আহ্বান করিলাম; সে মুখ মুড়িতে পারিল না।—নিকটে আসিল। একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া গোপনে পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

গোপাল সে কথায় তেমন কিছু উত্তর দিল না। মোটের উপর বলিল, 'আমি এখন আছি বেশ। টাকাকড়ি আর কিছুদিন পরে পাঠাইব। এখন এদের দল ছাড়িলে অমঙ্গল ঘটিবে। আপনি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আর জিদ্ করিবেন না। এ দলের লোকেরা খুব ভাল।'

দল? গোপাল দুই তিনবার বলিল, এদের দল? এদের দল আবার কিসের দল! শুনিলাম, বাবু। বাবুর আবার কিসের দল? জিজ্ঞাসা করিলাম। গোপাল সে কথাও কিছু ভাঙিল না, সঙ্গে আসিতেও চাহিল না।

কথা হইতেছে, এমন সময় একটি বৃদ্ধলোক দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। খুব পাকা পাকা গোঁপ চুল, ততোধিক পাকা দীর্ঘ দাড়ি। লোকটি আসিয়াই কটমট চাউনিতে আমার দিকে একবার চাহিল। চাহিয়াই চলিয়া গেল। লোকটি বৃদ্ধ, কিন্তু দৃষ্টি যুবার ন্যায় তীক্ষ্ণ। বৃদ্ধ লোকের চক্ষু তেমন সতেজ হইতে পারে না। কেমন একটা ধাঁধা লাগিল। কথাবার্তা শেষ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। নীচেরই একটা ঘরের সম্মুখ দিয়া পথ। ঘরের ভিতর কেহ নাই;—খুব অন্ধকার। আমি চলিয়া গিয়াছি ভাবিয়া, গোপাল আর সেই বৃদ্ধটি কি বলিতে বলিতে নীচে নামিয়া আসিতেছে। সেই কথোপকথনের মধ্যে আমার নামের উল্লেখও শুনিলাম। কৌতূহল হইল, তাড়াতাড়ি সেই অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। বৃদ্ধ ও গোপাল কথা কহিতে কহিতে আসিয়া, আমার একটু দূরেই রোয়াকের এক দিকে আসিয়া বসিল।

বৃদ্ধ লোকটি বলিল, 'তুমি পাছে লোকটার কাছে কিছু বল, এই জন্যই আমি গিয়াছিলাম। লোকটার নাম আমি জানি। বড় বদ লোক।—কোনও সন্দেহ করে নাই ত?'

'কিছু না। তোমাকে চিনতেই পারে নাই। তুমি যখন যেমন সাজ, আমরাই তখন চিনিতে পারি না; বাহিরের লোক কি করিয়া চিনিবে। সে পথে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

'না না, তুমি বুঝ না। লোকটা বড় বদ্। এখান হইতে ত উঠিতেই হইতেছে, তবে আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। কাশীর পত্র যখন আসিয়াছে, তখন আর এদেশে থাকাই নয়; তবে যাহারা দেশে গিয়াছে, তাহাদের জন্য যে দুই চারি দিন অপেক্ষা; সে অপেক্ষা বরং অন্যত্র থাকিয়া করা যাইবে; এখানে আর তিলার্ধও নয়।'

'তবে আমার ভাগ। খাঁ সাহেবের মুখে শুনিলাম, দেশে বড় কষ্ট হইয়াছে। ভাগের টাকাটা তাহাদিগকে না দিয়া আমি যাইতে পারিব না। তাহারা অনাহারে মারা যাইতেছে।'

'টাকা কাশীতে গিয়া দিব। তুমি যখন অবিশ্বাস করিতেছ, তখন আমি বা না করিব কেন? তুমি বলিতেছ, টাকা না পাইলে আমি যাইব না; আমি বলিতেছি, তুমি না গেলে টাকা পাইবে না। সেখানে গেলে টাকা বহিয়া আনিতে পারিবে না। সরকারে—দেশের লোকে সেখানে মনান্তর ঘটিয়াছে। এই সময়ই ত সুযোগ। যত দোষ সব দেশের লোকের ঘাড়ে পড়িবে। আমরা গিয়া পৌঁছিলে তাহারা সাহস পাইবে। কোনও গতিকে একবার মালখানা লুঠিতে পারিলেই আজীবন পায়ের উপর পা দিয়া কেন বসিয়া খাও না। চল, টাকার ভাবনা কি?'

'না;—তা আমি যাইব না। আগের ভাগ না পাইলে আমি আর তোমাদের দলে থাকিব না।'

'আমাদের হাতছাড়া হইয়া তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় গিয়া পরিত্রাণ পাইবে? আমরাই তোমাকে বিপদে ফেলিব।—প্রাণ লইব। তুমি আমাদের সবই জান;—তোমাকে কি আমরা অমনি ছাড়িতে পারি?'

'একা বলিয়াই এত কথা বলিতেছ; এ দলে আমার দিকে দাঁড়ায়—এমন কেহ নাই বলিয়াই এত কথা বলিতে সাহস করিতেছ; কিন্তু যদি কেহ থাকিত, তবে তোমাকে একবার বুঝিয়া লইতাম।'

'আমি আছি।' দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া বুড়াকে জড়াইয়া ধরিলাম,—বলিলাম, 'গোপাল, আমি আছি;—ভয় কি?'

সে ত বুড়া নয়, নবীন যুবা। অক্লেশে আমার বাহু হইতে মুক্ত হইল, আবার ধরিলাম। দুজনে রীতিমত ধস্তাধস্তি। সহসা মস্তকে আঘাত পাইলাম—জ্ঞান হারাইলাম।

সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি, আমি দোতালায় একটি ঘরে ভূমিশয্যায় পড়িয়া আছি। কেহ কোথাও নাই—ঘরেও কিছু নাই। বাড়িটি নিস্তব্ধ। অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলাম। ভয়ানক তৃষ্ণা। খুঁজিয়া খুঁজিয়া জল পাইলাম—পান করিলাম;—চাদর ছিঁড়িয়া মাথায় বাঁধিলাম। বেলা তখন বড় বেশি নাই।

বাড়িতে জনমানব নাই। জিনিসপত্রও কিছু নাই। দল পলাতক। গোপাল তবে গেল কোথা? বাইরে আসিয়া অনুসন্ধান লইলাম; শুনিলাম, বাবুর দল জিনিসপত্র লইয়া আহারান্তেই চলিয়া গিয়াছে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল,—মানসিক অবস্থা আরও ভয়ানক; সারাদিন অনাহার। মাথার আঘাত তেমন গুরুতর নয়, তবে কাহিল করিয়াছে খুবই। পাল্‌কি করিয়া সহরে আসিলাম।

কাশী যাইব। নিশ্চয়ই যাইব। হয় মরিব, না হয় ধরিব। একটু সুস্থ হইয়া নিজ বাসায় আসিলাম। কতদিন হইবে জানি না; সুতরাং বাসার চলাচলের বন্দোবস্ত করিলাম। সুখময়ীকে, গোপালের জননীকে আশা দিলাম। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সুখময়ী সঙ্গে যাইতে চাহিল। সঙ্গে গেলে আর কিছু হউক, না হউক, কাশীদর্শন

হইবে। সুখীর ইচ্ছা, যদি গোপালকে দেশে আনিতে পারা যায়, তবেই সে দেশে ফিরিবে,—না হয় জীবনের শেষ সময় কাশীর ছত্রে ছত্রে ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিবে। অনুরোধ ত্যাগ করিতে পারিলাম না, সঙ্গে লইতে হইল।

আমরা সহরে আসিলাম। এখানে হইতেই কাশীতে গহনার নৌকা[৯] যাতায়াত করে। বড় বড় নৌকা; একশত দেড়শত যাত্রী এক এক খানা ভড়ে[১০] বোঝাই হয়। সেই রকম একখানা নৌকায় দুজনে কাশী যাত্রা করিলাম।

খুব সুবাতাস বহিলেও কাশী পৌঁছিতে দেড় মাস লাগে। দেড় মাস কাল একত্র বাস; অনেক যাত্রীর সহিত ভাব হইল। নৌকায় এক সাধু ছিলেন, তিনি বড় ভদ্রলোক। অতি অমায়িক—অতি সদালাপী—অতি সাধু। অধিক সময় সাধু-সঙ্গ, হিন্দুশাস্ত্রের অনেক কথাই এই নৌকা যাত্রার খাতিরে শিখিয়া লইলাম।

একদিন ঝড়। ভয়ানক ঝড়। গঙ্গা সেখানে তেমন প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঝড়ের তোড়ে গঙ্গার মূর্তি বড় ভীষণ বোধ হইল। যাত্রী মহলে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বিভ্রাটের একশেষ—কখন নৌকা ডুবিয়া যায়—সকলে কেবল সেই প্রতীক্ষাই করিতেছে। নৌকা আর থাকে না। মাঝি মাল্লারা নৌকা রাখিতে পারিতেছে না। সকলেই ভীত—আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় সকাতর।

নৌকা বানচাল্ হইল। ঝড়ের তোড়ে চড়ায় লাগিয়া গহনার নৌকা ফাঁসিয়া গেল। চারিদিকে হাহাকার। জল সেখানে এক কোমর। চড়ার উপর বেশি জল নাই। যাত্রীরা লাফাইয়া লাফাইয়া সেই কোমর জলে নামিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সকলেরই অগ্রে নামিবার চেষ্টা—সুতরাং মহাগোল। সঙ্গে স্ত্রীলোক, বিপদে

পড়িলাম। তত গোলের মধ্যে স্ত্রীলোক লইয়া নামা অসম্ভব; অপেক্ষা করিতে হইল। অপেক্ষায় আছি, একটু ভিড় কমিলেই নামিব বলিয়া অপেক্ষায় আছি, হঠাৎ মস্তকে আঘাত। ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। চৈতন্য হারাইলাম।

যখন জ্ঞান হইল, তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে। এক নৌকা জল, চড়ায় বাঁধিয়া জলপূর্ণ নৌকা আটকাইয়া গিয়াছে; মাঝিরা গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে; আর আমি সুখময়ীর সেবায় একটু খাড়া হইয়া বসিয়াছি। যাত্রীরা সব তীরে উঠিয়াছে।

সুখময়ী বলিল, 'আমি দেখিয়াছি। সেই সাধু লোকটিই মাথায় বাড়ি দিয়াছে। পেছন হইতে সেই লোকটিই লাঠি মারিয়াছে।' বিশ্বাস হইল না। তেমন জ্ঞানীলোক, সে কি নির্দোষ লোকের মাথায় লাঠি মারিতে পারে?

আঘাত তেমন সাংঘাতিক নয়, সহজেই সারিয়া উঠিলাম। একখানা ছোট নৌকা ভাড়া রাখিয়া দেশে যাইতেছিল; যাহারা সমর্থ, তাহারা দ্বিগুণ ভাড়া দিয়া সেই নৌকায় কাশী যাত্রা করিল। গরীব লোকেরা সে দিন নদী তীরেই রহিল। আমরা ছোট নৌকাতেই চলিলাম। সাধু যখন ছোট নৌকায় উঠিয়াছে, তখন আমাদেরও উঠা চাই। লোকটার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একটু ভাল করিয়াই লওয়া চাই।

সাধুটিকে বেশ ভাল করিয়াই দেখিলাম। চেলাগুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গও লক্ষ করিলাম। ক্রমে সন্দেহ বাড়িল। সুখময়ী আরও বলিল, 'এইরকম সাধু—ঠিক এই চেহারা—কয়েকদিন চাঁদসড়কে ঘুরিয়াছিল।' স্ত্রীলোক, ভস্মভূষণ দেখিলেই ভাবে সাধু। এক প্রকার বেশভূষণ, ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। সুখময়ী এখনও সেই কথাই বলিল। সে জিদ্ করিয়া বলিতে লাগিল, 'এই সাধুই চাঁদসড়কে

গিয়াছিল। গোপালের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। একদিন আমাদের বাড়ি অতিথিও হইয়াছিল।'

ক্রমে ক্রমে—দেখিতে দেখিতে গোপাল মিলিল। খুব দাড়ি চুল, মাথায় জটা, গায়ে ছাই, চেহারায় কিছু মাত্র চেনা যায় না; তথাপি বুঝিলাম, যে শিষ্যটি সর্বদাই মৌনী হইয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকে, সেইটিই গোপাল। হাঁ ত, গোপালই ত। সুখময়ীও বলিল, সেই-ই বটে। সুখময়ীর ইচ্ছা, সে এমনি ভ্রাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া একবার কাঁদে। ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া নিবারণ করিলাম। এখন যে আমরা অসহায়।

সন্ধ্যার সময় অসি ঘাটে[১১] গিয়া নৌকা লাগিল। সকলেই নামিল—আমরাও নামিলাম। চেলাদের লইয়া সাধু অগ্রগামী হইলেন। হাসিয়া বিদায় লইলেন। গমনকালে আশীর্বাদও করিলেন। গোপাল দুই তিনবার ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে চাহিল। বুঝিলাম, গোপালই বটে। সাধুর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছি। কতক দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, পশ্চাতে এক লগুড় হস্তে চেলা। ভাবেই বুঝিলাম, চেলা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। কোথায় আমরা অনুসরণ করিব, না বিপরীত। এখন যাই কোথা? সঙ্গে স্ত্রীলোক।

ভয় হইল। সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য রাস্তা ধরিলাম, চেলা পাছু ছাড়িল না। সাধু চলিয়া গিয়াছে, চেলারাও গিয়াছে, এ চেলাটি যায় না কেন? ক্রমে বাঙালীটোলায় আসিলাম। চাঁদসড়কেরই একটি আলাপী লোক এখানে—এই বাঙালীটোলায় থাকেন, বিষয় কার্য করেন, তাঁহারই আশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরে বাহিরে আসিয়া দেখি, চেলা নাই। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বাবুটি সপরিবারেই আছেন, দেশের মেয়েমানুষ পাইয়া

গৃহিণী সন্তুষ্ট হইলেন, সুখময়ীর দায় হইতে এক্ষণে অব্যাহতি পাইলাম। সে রাত্রি থাকিলাম।

কাশীর অবস্থা বাবুর মুখেই শুনিলাম। পথে ঘাটে এখন লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। টাকাকড়ি লইয়া এখন আর কেহ পথ চলিতে সাহস করে না। রাহাজানি, লুটতরাজ, কাশীতে নিত্য নিত্য ঘটিতেছে। শত-চেষ্টা নিবারণ হইতেছে না।

শরীর বড় অসুস্থ। মাথার বেদনা এখনও খুবই আছে। দুই দিন বাবুর বাসায় থাকিয়া একটু সুস্থ হইলাম। তৃতীয় দিন প্রাতেই শুনিলাম, রামনগরে[১১] ডাকাতি হইয়াছে। একটা মানুষও খুন হইয়াছে। সেদিন একটু ভাল আছি, প্রাতেই এই গল্প শুনিয়া স্নান করিতে গিয়াছি, পথে দেখি, চেলা গোপাল। চিমটার ধ্বনি করিতে করিতে গোপাল বরুণার[১২] দিক হইতে আসিতেছে। হঠাৎ গোপালের হাত ধরিলাম। দৃঢ় মুষ্টিতেই ধরিলাম। বলিলাম, 'গোপাল, তোমাকে আমি যে চিনিয়াছি। সুখময়ী এখানে আছে। চল, দিদির সঙ্গে দেখা করিবে চল।'

গোপাল প্রথমে অভ্যাসমত দুই এক কথা হিন্দিতে কি বলিল, গ্রাহ্য করিলাম না। হাত ধরিয়া বাবুর বাসায় লইয়া আসিলাম। সুখময়ী সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিল। গোপালের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। গোপালকে আর যাইতে দিলাম না।

বৈকালে রাস্তায় মহাগোল। দেখিতে বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, পুলিশের লোক আমি কেবল বাসার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনি সে গোলের ভিতর হইতে একজন কে বলিয়া উঠিল, 'ওই-ওই লোকটি ওই দরজায়—ওই ডাকাত।' তৎক্ষণাৎ আমাকে গেরেপ্তার। গোল শুনিয়া গোপালও বাহিরে আসিল। এখন

আর সে জটাজূটে ঢাকা চেলা না, সেও আসিবামাত্র সেই লোকটির শনাক্ত মতে গেরেপ্তার। দুজনে চকের থানায় চলিলাম। গমন মাত্র চালান। আমাদের হাজত গারদ।

পরদিনই বিচার আরম্ভ। তিন চারি জন লোক আমাদিগকে শনাক্ত করিয়া বলিল যে, রামনগরে ডাকাতি আমরাই করিয়াছি। পলাইয়া আসার সময় তাহারা আমাদিগকে দেখিয়াছে, সঙ্গ লইয়া বাসা পর্যন্ত আসিয়াছে, ডাকাত লোক আমরা—ধরিতে সাহস করে নাই। থানায় গিয়া সংবাদ দিয়াছে।

আমি নিজের পরিচয় দিলাম। হুকুম হইলে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বাবুর বাসা হইতে হুকুমনামা আনাইয়াও দেখাইতে পারি, বলিলাম। হুকুম হইল। তখন একজন পদাতিক বাবুর বাসায় আমার ব্যাগ আনিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'বাসায় ব্যাগ নাই। একটু পূর্বে একজন পুলিশ পদাতিক আসিয়া সে ব্যাগ লইয়া গিয়াছে।' মাথায় বজ্রাঘাত। হাকিম চটিলেন। আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এদিকে কড়া শাসনেরও দরকার হইয়াছে। হাকিম আমাদের দুজনেরই প্রতি কঠিন দণ্ড দিলেন। কারাবাসের আদেশ দিলেন, সাত সাত বৎসর। অদৃষ্টের লেখা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম।

গারদ-রক্ষকের অনুমতি লইয়া, কৃষ্ণনগরে পত্র লিখিলাম। ব্যাপারটা আগর্ভ জানাইয়া, নিজের দুরবস্থার কথা লিখিয়া, শেষে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলাম। তিনমাস পরে সাহায্য আসিল। মুক্তি পাইলাম।

গোপালের সন্ধান মতে সাধুর সকল আড্ডাই অনুসন্ধান হইল, সাধুর সাক্ষাৎ মিলিল না। যাহারা সাক্ষী দিয়াছিল, তাহাদিগকেও

আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনমাসের ঘটনা, কোনও ফল ফলিল না। অগত্যা গোপাল ও সুখময়ীকে লইয়া দেশে ফিরিলাম।

টীকা

১. **কৃষ্ণনগর**: পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার প্রাচীন শহর। অবস্থান জলঙ্গী নদীর বাম তীরে। নদীয়ার মহারাজা রাঘব এই অঞ্চলে অবস্থিত রেউই গ্রামে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁর পুত্র রুদ্র রায় রাজধানীর নামকরণ করেন কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য রাজনীতির এক বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে সমাদৃত হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭১০-৮৩) রাজত্বকালে। কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন ইংরেজদের বশংবদ। কৃষ্ণনগরে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্প এবং মিষ্টান্নদ্রব্য সরভাজা ও সরপুরিয়া বিখ্যাত।

২. **চাঁদ সড়ক**: চাঁদ সড়ক বা চাঁদ সড়কপাড়া কৃষ্ণনগর পুরসভার ষোলো নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত একটি অঞ্চল বা পাড়া।

৩. **সরেওয়ার**: মুখ্য বা প্রধান। এক্ষেত্রে প্রধান বা বিশেষ সংবাদ।

৪. **মুরশিদাবাদ**: বাংলার নবাব মুরশিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নিয়ে আসেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় রাজধানী স্থাপনের আগে পর্যন্ত বাংলার রাজধানী এবং ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাকে ভাগীরথী নদী দুটি প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। বর্তমান জেলা সদর বহরমপুর ভাগীরথীর বাম তীরে অবস্থিত এবং সামান্য উত্তরে মুর্শিদাবাদ শহরের অবস্থান। মুর্শিদাবাদে হাজার দুয়ারী প্রাসাদ নির্মিত হয় ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। বাঁকাউল্লা বা বরকতউল্লা খাঁর

সমসময়ে ভারতের রাজধানী কলকাতায় হলেও মুর্শিদাবাদ শহরের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল নবাব বাহাদুরের বাসস্থল হিসেবে।

৫. **বড় সাহেব**: সম্ভবত ঠগী কমিশনার উইলিয়ম হেনরি স্লীম্যান।

৬. **খাগড়া**: বহরমপুর শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চল বিখ্যাত কাঁসা ও পিতলের বিভিন্ন দ্রব্যের নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে। বর্তমানে এই অঞ্চলে বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে। হাতির দাঁতের কাজ এবং কাঠ-খোদাইও এখানকার বিখ্যাত শিল্প।

৭. **সওদাবাদ**: সৈদাবাদ বা সৈয়দাবাদ। খাগড়া থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে, মুর্শিদাবাদের পথে একটি অঞ্চল।

৮. **রাহী**: পথিক। এক্ষেত্রে, কোনও বিদেশি বা অচেনা আগন্তুক।

৯. **গহনার নৌকা**: বড়ো নৌকা, যাতে একসঙ্গে বহু লোক আরোহণ করে দূর যাত্রায় যেতে পারে।

১০. **অসি ঘাট**: বারানসীর গঙ্গাতীরবর্তী দক্ষিণতম ঘাট। এই ঘাটের লাগোয়া অংশে অবস্থিত লোলার্ক কুণ্ড একটি অতি পবিত্র হিন্দু তীর্থ। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে অসি ঘাটে বহু সহস্র পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে।

১১. **রামনগর**: উত্তর প্রদেশের বারানসী জেলার শহর। বেনারস শহরের বিপরীতে গঙ্গার পূর্ব কূলে অবস্থান। কাশীর রাজা বা কাশীনরেশ অবস্থান করেন রামনগরের কেল্লায়। বর্তমানে রাজত্ব নেই। তবু রাজার বংশধর, অষ্টাদশ শতকে রাজা বলবন্ত সিং নির্মিত এই কেল্লাতেই বসবাস করেন। অধুনা কেল্লার একাংশে রাজ-পরিবারের সংগৃহীত জিনিসের সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। রামনগরের কেল্লা চুনার থেকে আনা পাথরে মুঘল স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত। দেশের প্রাক্তন

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মস্থান এই শহরে মহাসমারোহে রামলীলা উৎসব পালিত হয়।

১২. **বরুণা**: প্রায় একশত কিলোমিটার দীর্ঘ বরুণা নদী গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিশেছে বারাণসী শহরের উত্তর অংশে। বারাণসী শহরের উত্তর সীমানা নির্ধারণ করে এই নদী। অনেকে মনে করেন বারাণসী নামের উদ্ভব বরুণা বা বরনা নদীর নাম থেকে। বরুণা নদী উত্তরে এবং দক্ষিণে অসি নদীর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত শহরের নাম দুই নদীর নামের মিলনে। বরুণা + অসি = বারাণসী।

গহনাভোজী কুমীর

জলপন্থী ঠগীর অদ্ভুত কৌশল!

এ এক নূতন কথা। জলঙ্গীর[১] মোহনার নিকটেই রুকুনপুর গ্রাম। নদীতীরেই গ্রাম, গ্রামের লোক নদীর জলই ব্যবহার করে। গাঙ্গেয় ঘাটেই ইতর ভদ্রলোকের স্ত্রীপুরুষ স্নান করে। এই নদীতে না কি একটা গহনাভোজী কুমীর আসিয়াছে। সর্বত্রই গুজব, গহনাভোজী কুমীর। কুমীর মানুষ খায় না, মানুষের গহনা খায়। বিধাতার সৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া কথা নাই। গ্রামের লোকে প্রমাণও পাইয়াছে; সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস, কুমীর গহনাভোজীই বটে।

কামিনী আদ্যনাথ বিশ্বাসের রক্ষিতা। বিশ্বাস নীলকুঠীর চাকরি করেন, ঘুষঘাসের জোরে বেশ উপার্জন আছে; কামিনী সেই বিশ্বাস মহাশয়ের ভাবের মানুষ। জাতিতে হাড়ি হইলে কি হয়, কামিনীর ভাগ্য ভাল। সোনার বালা রূপার মল কামিনী বার মাসেই ব্যবহার করে। সেদিন কামিনী বৈকালে গা ধুইতে গিয়াছিল, আর ফিরে নাই। পুলিশ তদন্তে লাশ পরপারের এক কশাড়বনে পাওয়া যায়—লাশের দেহে কিছুমাত্র ক্ষত নাই। নাই কেবল বালা আর মল। তার পর দিনই চাটুজ্জেদের সেজোবউ—তিনি বড়লোকের মেয়ে—দশ পাঁচ ভরি সোনা তাঁহার গায়েই থাকে,—তিনি সেদিন স্নান করিতে গিয়াছিলেন—গলা জলে দাঁড়াইয়া গাত্র মার্জনা করিতেছিলেন, তিনি ডুব দিলেন—আর উঠিলেন না? ঘাটে বিস্তর লোক ছিল, তখনি জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান হইল, লাশ মিলিল না। পরদিন সেজবধূর শব

জলঙ্গীর টেকে[১] পাওয়া গেল। সেজবধূর দেহে কেবল প্রাণ নাই, নতুবা দেহ কিছু মাত্র বিকৃত হয় নাই। নাই কেবল গহনা। বালা, অনন্ত, মাকড়ি আর গোট; সোনার এই চারিখানি, আর ৪০ ভরির রূপার মল। এই সকল গহনার একখানিও নাই। এই হইতেই দেশময় রাষ্ট্র—আপামর সাধারণের বিশ্বাস, জলঙ্গীতে গহনাভোজী কুমীর আসিয়াছে।

এই গল্প বাসায় বসিয়া শুনিলাম। মামুদপুর থানায় পত্র লিখিয়া জানিলাম, ব্যাপার সত্য। দারগা জলডুবি বলিয়া রিপোর্ট দিয়া লাশ জ্বালাইতে হুকুম দিয়াছেন। বড় আশ্চর্য কথা। লাশ দেখিবার ইচ্ছা ছিল, ঘটিল না। সন্ধানে রহিলাম।

অধিক দিন সন্দেহে সন্ধানে থাকিতে হইল না। তিন চারি দিন পরেই সংবাদ আসিল। রুকুনপুরের গায়ে গায়ে লাগা হৈবৎপুর; সেখানকার বসুদের বড় মেয়ে—এই গতকল্য মাত্র শ্বশুর বাড়ি হইতে আসিয়াছে; গায়ে সকল গহনাই ছিল; তাহাকেও গহনাভোজী কুমীরে ধরিয়াছিল। বসুকন্যার লাশও গাঙ্গের ধারে এক কশাড়বনে মিলিয়াছে। তাহারও অক্ষত শরীর, কেবল গহনা নাই। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র যাত্রা করিলাম।

খুব তাড়াতাড়ি ঘোড়-সওয়ারে গিয়াও পৌঁছিতে অপরাহ্ন হইল। লাশ দেখিলাম। যেন নিদ্রিত। বেশ করিয়া ফিরাইয়া ঘুরাইয়া লাশের সর্বাঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল বাম পদে—পায়ের পাতার উপরে পা-বেড়া একটা কালশিরা চিহ্ন। কুমীর প্রায় লেজ দিয়া মানুষ বাগাইয়া লইয়া, শেষে মুখে করিয়া চলিয়া যায়। তাহাতে মানুষের গায়ে লেজের কাঁটার দাগও থাকে, দাঁতের দাগও থাকে। শবের শরীরে সে সকল ত কিছু নাই। চিহ্নের ভিতর বাম পদের কেবল সেই কালশিরা। শক্ত করিয়া সেই স্থানটা দড়ি দিয়া

বাঁধিলে যেমন কালো দাগ হয়, ঠিক তেমনি দাগ। কুমীর কি লেজ দিয়া কেবল এই স্থানটাই ধরিয়াছিল? ধরুক, কিন্তু, দাঁতের দাগ কৈ? এ বড় বিষম সমস্যা।

লাশ আর রাখিয়া ফল নাই। লাশ জ্বালাইবার হুকুম দিয়া বাসায় ফিরিলাম। কত রকম চিন্তাই যে আসিতে লাগিল, কত রকম কথাই যে ভাবিতে লাগিলাম, তাহার আর ইয়াত্তা নাই। শেষে স্থির করিলাম, কুমীরটাকে ধরিতে হইবে। কুমীর ধরিবার চার চাই। কুমীরটা বড় গহনা ভালবাসে; সুতরাং সেই রকম চার চাই। সেই ব্যবস্থাই করিলাম।

কিছু কম একমাস পরে, তিনটি গহনা পরা মেয়ে গোয়েন্দা লইয়া বজরা করিয়া জলঙ্গী বহিয়া চলিলাম। গোপালকে আমার আরদালি করিয়া লইয়াছি, সেও সঙ্গে চলিল। নৌকা ক্রমে রুকুনপুরের ঘাটে গিয়া লাগিল। টেকের দুই দিকে দুখানা ছিপ্ জগতবেড়[৩] ফেলিয়া অপেক্ষায় রহিল। তাহারা ইসারামাত্র পরস্পর বিপরীত দিক হইতে জাল টানিয়া আনিবে। তীরেও দুই পাঁচ জন লোক সময়কালে হামি[৪] হইবার জন্য আড়ে আড়ালে রহিল। তখন স্নানের বেলা।

পুরুষমানুষেরা বাজারে চলিয়া গেল; থাকিলাম কেবল মেয়ে মানুষ তিনটি, আর আমি। আমি বজরার ভিতরে রহিলাম, মেয়ে মানুষ তিনটি প্রথমে বজরার খড়খড়ি দিয়া উঁকি ঝুঁকি দিয়া—শেষে বজরার সম্মুখে গিয়া বসিল। স্নানের ঘাটের মেয়েদের সহিত কথা কহিতে লাগিল।

বিবিজান বড় বুদ্ধিমতী। সুন্দরীও বটে। যেবার রাঢ়ে আকাল হয়, সেই মন্বন্তরের সময় পোপ সাহেব, বিবিজানকে পথে কুড়াইয়া পান। সে তখন সাত আট বছরের। মেয়েটিকে দেখিয়া সাহেবের দয়া

হয়, রক্ষণভার লন। সে এখন উনিশ কুড়ি বছরের হইয়াছে। পোপ সাহেব আমাদের এই গোয়েন্দা পুলিশেরই একজন আধারের সহিত বিবিজানের বিবাহ দিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষেই তাহারা গোয়েন্দা-কার্যে নিযুক্ত আছে। বিবিজানের স্বামীও সঙ্গে আছে। গহনা পরিয়া বিবিজান যেন রাজরানীর মত দেখিতে হইয়াছে। সেই বিবিজান বজরার সম্মুখে বসিয়া জল লইয়া কুলি করিতেছে, আর ঘাটের মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিতেছে। দুর্ভাগ্য, আমাকে স্বামী পরিচয়ে পরিচিত করিয়া বিবিজান আমার গুণের গাথা শুনাইতেছে। আমি যে খুব বড় বাবু—তেমন বড় সাহেবের কুঠি, সেই কুঠির আমি যে বড় বাবু—বড় দেওয়ান, বিবিজান তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা করিতেছে। ঘাটের লোক হাঁ করিয়া শুনিতেছে।

ক্রমে বেলা ঢলিয়া পড়িল। বজরাতেই সকলের আহারাদি হইল,অপরাহ্ন। বিবিরা তখন জলে নামিলেন। মাঝিরা বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে; বজরার ভিতর হইতে আমি রাগ প্রকাশ করিতেছি, বিবিদের আর হয় না। গাত্র মার্জনার সঙ্গে সঙ্গে তিন বিবিতে গল্প। ঘাটে দুই তিন খানা নৌকা লাগান ছিল, আরও তিনখানা আসিয়া লাগিল। সবগুলিই প্রায় জেলে ডিঙ্গি। নৌকাওয়ালারা নৌকা বাঁধিয়া চলিয়া গেল। ঘাটে ক্বচিৎ একটি লোক আসিতেছে যাইতেছে মাত্র।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। সূর্য্যদেব পাটে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, সকলেই গহনাভোজী কুমীরের গতাগতি লক্ষ করিয়া বসিয়া আছি। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পুড়িয়া পুড়িয়া লাল হইয়া উঠিয়াছেন, তাই জলঙ্গীর জলে ডুবিয়া শীতল হইতেছেন। জলঙ্গীর জল লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই লাল জলে—খুব দূরে কালো

কি একটা বস্তু যেন ভাসিয়া আসিতেছে। লক্ষ করিলাম। বস্তু ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। তোবা—এ যে একটা কেলে হাঁড়ি। কোথাও নৌকাযাত্রী ভাত রাঁধিয়া শেষে হাঁড়িটা ভাসাইয়া দিয়াছে।—আশা নির্মূল।

হাঁড়িটা কিন্তু উপুড় হইয়া ভাসিতেছে। কুমীর যখন মুখ ভাসান দেয়, তখন একখানা কালো ঘুঁটের মত দেখায়। এটা তাহা হইতে একটু ডাগর। গহনাভোজী কুমীরের মাথা ত নয়! আবার লক্ষ করিয়া থাকিলাম।

নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বহিয়া চলিয়াছে। স্রোতও সুতরাং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে। কালো পদার্থটা কিন্তু উজান আসিতেছে। তবে নিশ্চয়ই এ গহনাভোজী কুমীরের মাথা! জালুকদিগকে ইঙ্গিত করিলাম।

রুকুনপুর নদীর পূর্বতীরে।—ঘাট সুতরাং পশ্চিম মুখে; কাল বস্তুটা ক্রমে পূর্বমুখ হইল। ঘাটের দিকে আসিতে লাগিল। কালো বস্তুটা স্রোতে ডুবিতেছে—ভাসিতেছে। কতক্ষণ ডুবিয়া ভাসিয়া শেষে কিন্তু কতক্ষণ পর্যন্ত আর ভাসিল না। ভয় হইল। জালুকদিগকে খুব শীঘ্র শীঘ্র জাল ফেলিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। কি জানি, বিবিজানদেরও বজরায় উঠিতে বলিলাম। বস্তু কিন্তু আর মাথা তুলিল না।

জগৎবেড় জলঙ্গীর জল সেচিয়া আনিতে লাগিল। উভয় নৌকা নিকটবর্তী হইলে, জাল গুটাইবার সময়—খুব জালছেঁড়া একটা টান লাগিল। সে টানে ছিপ্ দুখানা পর্যন্ত যেন ডোব ডোব হয়ে উঠিল। জালুকেরা পর্যন্ত ভীত; কেবল তাড়নার ভয়ে তখনও জাল গুটাইতে লাগিল। ক্রমে নিকট—আরও নিকট; জালে কতকগুলি বড় বড় মাছ আর গহনাভোজী কুমীর গেরেপ্তার হইল। নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য দুইটি

ছিদ্রবিশিষ্ট একটি কেলে হাঁড়ি মাথায়—একটা কালো মুষ্কো জওয়ান। জওয়ানটার কোমরে শিকল বাঁধা। মনে পড়িল;—বসুকন্যার পায়ে সেই কাল শিরার দাগ। বুঝলাম, এইরূপ হাঁড়ি মাথায় দিয়া ইহারা নৌকায় আড়ে আড়ে আসিয়া, গহনাপরা মেয়েমানুষের পায়ে এই শিকল বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যায় এবং গহনাগুলি খুলিয়া লইয়া লাশ ফেলিয়া দেয়। লোকটা যেমন জওয়ান তাহাতে মেয়েমানুষেরা জলের মধ্যে শীঘ্রই কায়দা হয়—দমবন্ধ হওয়ায় মারা যায়। ইহারও মাথায় হাঁড়ি। হাঁড়ি মাথায় দিয়া ইহারা জলের ভিতর দিয়াই স্ত্রীলোকদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ি মাথায় থাকায় ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের কোনও কষ্ট হয় না, কিন্তু ভীত স্ত্রীলোকেরা শীঘ্রই মারা যায়। ব্যাপার ভাবিয়া শরীর রোমাঞ্চ হইল।

বিস্তর চেষ্টা, লোকটা কথা কহিল না। ঠিকই যে সে এইপ্রকার কৌশলেই মেয়েমানুষের পায়ে শিকল বাঁধিয়া হত্যা করিত—গহনা লইত, তাহার অন্য প্রমাণ কিছুমাত্র নাই। কেবল অনুমান; পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, লোকটা কথা কহিতে পারে; জিহ্বাদি ভাল, মানুষের যেমন থাকে,—ইহারও তেমনি আছে, তথাপি সে কথা কহিল না। শত চেষ্টা, লোকটা আমলেই আনিল না। লোকটা পাকা বটে। অন্য প্রবল প্রমাণ নাই, তবে অনুমান সিদ্ধ বটে। জলপন্থী ঠগীর বুদ্ধিকৌশল অনেকেই দেখিয়াছি, তদন্ত করিয়াছি এবং সমকর্মীদিগের মুখেও অনেক গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু এমন অভিনব উপায় ডাকাতি এই নূতন। যে শুনে সেই বলে নূতন। গতিকে তিন বৎসর মাত্র মেয়াদ হইল। পরে আরও চেষ্টা করা গেল, কিন্তু জলঙ্গীর জলে গহনাভোজী কুমীরের আর জোড়া মিলিল না। তবে লোকের ভয় ঘুচিল।

টীকা

১. **জলঙ্গী**: পদ্মানদী থেকে বার হয়েছে এই নদী। উৎসের নিকটবর্তী গ্রামের নামও জলঙ্গী। গ্রামের নামেই নদীর নাম। মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলার মধ্যে দিয়ে ২১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রবাহের পর মায়াপুরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে খানিক এগিয়ে সঙ্গম ঘটেছে ভাগীরথীর সঙ্গে। সঙ্গমের পশ্চিমে, ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপ অবস্থিত। কৃষ্ণনগর ও সন্নিহিত অঞ্চলে এই নদীর খড়ি, খড়ে বা খড়িয়া নাম প্রচলিত। অন্নদামঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত গাঙ্গনী হল এই নদী। অনুমান করা হয় এই নদী সৃষ্টি হয়েছে খ্রিষ্টিয় সপ্তদশ শতকে। তার আগে এর কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

২. **টেকে**: 'টেক' শব্দের অর্থ নদীর বাঁক।

৩. **জগৎবেড়**: সুদীর্ঘ টানা জাল।

৪. **হামি**: সাক্ষী হিসেবে হাজির থাকা লোকজন।

৫. **জালুক**: যে জেলেরা জাল ব্যবহার করে মাছ ধরে। জাল দিয়ে মাছ ধরতে বিশারদ।

উমোকান্ত

ভীষণ ষড়যন্ত্র!—শিশু বলি।

মেহেরপুরের ক্রোশ দুই পূর্বে হোসেনপুর কানসারণ।[১] হোসেনপুর চৌদ্দকুঠির সদর কুঠি। সেই সদর কুঠির কুঠিয়াল, মেষ্টর[২] রাবট জন্সন। নীলকর জন্সন প্রবল প্রতাপশালী নীলকর। হোসেনপুর অঞ্চলের প্রজালোক জন্সনের তাদৃশ কঠোর শাসনে ভীত—মনে মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট। রাধাকান্তপুরের মালেক-জমিদার নরহরি মুখোপাধ্যায়ের দুই আনা সওয়া তের গণ্ডার অংশীদার শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী নিজ অংশ নীলকর জন্সনকে মেয়াদি ইজারা দিয়াছেন, জন্সন সেই ইজারা সূত্রে তরফ রাধাকান্তপুর—তের মৌজার মালেক হইয়া উঠিয়াছেন। নরহরি বাবুকে মালিক মকর্দমায় জেরবার[৩] করিয়া তাঁহার অংশ পর্যন্ত ইজারা লওয়াই জন্সনের ইচ্ছা।

প্রজারা নরহরি বাবুর পক্ষ। তিনিই তাহাদের মালেক জমিদার, তিনিই তাহাদের রক্ষক; প্রজারা নরহরি বাবুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। প্রজারা সহায় থাকায়, সাহেব বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

জমিদারে ইজারাদারে ত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে, এদিকে প্রজাদেরও কাহিল করিবার চেষ্টা হইতেছে। উভয় দলেই ঘোরতর মনোবিবাদ। প্রজারা ডঙ্কা করিয়াছে। একটু বিবাদের আশঙ্কা দেখিলেই হোসেনপুরের মণ্ডলবাড়ি ডঙ্কা পড়ে। দেখিতে দেখিতে তেরখানা গ্রামের প্রজা লাঠিসোটা লইয়া একত্রিত হয়। জন্সনও

লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা নিযুক্ত করিয়াছেন। কুঠি লুঠ হইবে,—এমন একটা জনরবও উঠিয়াছে। পুলিশ শান্তিরক্ষার জন্য হোসেনপুরে গিয়া ছাউনি করিয়াছে। উভয় দলের মুচলেকাও লওয়া হইয়াছে।

এমন দেড় মাস। আষাঢ় মাস গিয়া শ্রাবণ মাস পড়িল, কুঠিতে নীলকার্য আরম্ভ হইল, ভাল ভাল খেলোয়ার লোক দশ বার জন দলবদ্ধ হইয়া মাঠে মাঠে বেগার ধরিতে ছুটিল; মাল আখেরী[৪] —বাকিবকেয়া আদায়ের জন্য পাইক পেয়াদাগণ প্রজার দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল। প্রজারা শান্ত;—মিটমাটের কথা চলিতেছে।

'কাপ্তেন উমোকান্ত রায় বাসাবাড়ির উত্তরদ্বারী ঘরে শুইয়াছিল, তাহাকে আর পাওয়া যাইতেছে না।' কুঠির জমাদার ছাউনিতে আসিয়া এই মর্মে সংবাদ দেয়। সংবাদ প্রাপ্তির সময়, প্রভাত। এক প্রহরের সময় একজন চৌকিদার আসিয়া সংবাদ দিল, 'গ্রামের ছিরু মণ্ডল, হৈধর বিশ্বাস, নবীন রায় ও চিনিবাস মজুমদার, একটা মানুষকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, লোকে ইহা দেখিয়াছে।' এ লোকটা থাকিতে থাকিতেই আর একটা লোক আসিয়া সংবাদ দিল, 'দীনু দত্তের দোহায়[৫] কাপ্তেন উমোকান্ত রায়ের লাশ পাওয়া গিয়াছে।'

বড় মর্কর্দমা, আমাকেই যাইতে হইল। দোহার তীরে লোকারণ্য। লোকারণ্য ভেদ করিয়া লাশের নিকটে গিয়া দেখি, লাশ নয়—কাপ্তেন তখন মিটমিট চাহিতেছে। কুঠির তিন চার জন লোক খড়ের আগুন করিয়া সেঁক তাপ দিতেছে, মাথার নিকটেই কতকটা জায়গা খইমুড়কির[৬] বমিতে ভিজিয়া গিয়াছে, গলায় দড়া বাঁধা।

সাহেব স্বয়ং আসিয়াছেন। দেওয়ানজি রঘুনাথ রায় আসিয়াছেন, মহা ধুমধাম। সেবাশুশ্রূষা ষোল আনা রকমই চলিতেছে। কাপ্তেন এখনও কথা কহে নাই। দেওয়ানজি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিতেছেন, কাপ্তেন নীরব। খড়ের আগুনে দুধ গরম হইতেছিল, একটু গরম গরম দুধ খাইয়া উমোকান্ত যেন একটু সবল হইল। প্রথমে অস্পষ্ট—শেষে খুব মিহিসুরে কথা কহিতে লাগিল। দুই এক কথার পর এজেহার লইলাম।

'কাল রাত দেড় প্রহরের পর নিজ বাসায় আমি আমার আপন খাটে শুইয়াছিলাম। তন্দ্রা আসিয়াছিল। দম বন্ধ হওয়ায় জাগিয়া উঠি। চাহিয়া দেখি, হিরু আর চিনিবাস আমার পা দুখানা ধরিয়াছে, হৈধর মুখ চাপিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, নবীন রায় হাত বাঁধিতেছে। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; পারি নাই। হাত পা মুখ বাঁধিয়া ওই চারিজনে আমাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া চলিল। দীনু দত্তর দোহার ধারে আনিয়া নামাইল। সেখানে রামচরণ আর কেশব রায় বসিয়াছিল। তাহাদের কাছে বড় বড় দুটা কলশি ছিল। নবীন রায় সেই কলশি দুটা আমার গলায় বাঁধিল। শেষে কয়জনে ধরিয়া আমাকে জলে নামাইল। কতক দূর আনিয়া সেইখানে ডুবাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। প্রাণ যায় দেখিয়া প্রাণপণ বল দিয়া কলশি দুটা গলা হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বাঁধা হাত আর বাঁধা পা লইয়া একটু একটু করিয়া ধারের দিকে আসিলাম। কতদূর আসিয়াছিলাম জানি না। বড় দুর্বল ছিলাম—অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। আর জানি না।'

জমির মিস্ত্রি বলিল, 'শেষ রাত্রে মহিষদের জল খাওয়াইতে দীনু দত্তর দোহায় গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, একটা মানুষ কাদায় মুখ ঘুসিয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। আমার চিৎকারে গম্ভীর, হরি, ছিরাম আর পেয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা মাঠেই ছিল। সকলে তুলিয়া দেখি, রায় মহাশয়। সকলে ধরাধরি করিয়া এই গাছতলায়

আনিলাম। আগুন ছিল, খড় আনিয়া জ্বালিলাম—সেঁক তাপ দিলাম। সেক দিতে দিতে তিনবার বমি হইল।'

জমির যে চারিজন লোকের নাম করিল, তাহারাও ঠিক এই প্রকার সাক্ষ্য দিল। আসামিদিগকে চালান দিতে হইল।

যে স্থানটায় উমোকান্ত ডুবিয়াছিল, সে স্থানের জল আড়াই হাত মাত্র। এই এতটুকু জলে সাড়ে তিন হাত একটা মানুষ ডুবিতে পারে কিনা। তিন মোন বালি ভরা কলশি দুটা হাত-পা বাঁধা একটা লোককে ডুবাইয়া রাখিতে পারে কি না? অজ্ঞানের পূর্বে লোকের যে বল থাকে—সে বলে কত মোটা গলায় বাঁধা দড়ি ছিঁড়িতে পারা যায় কি না; এ সকল প্রশ্ন মনোমধ্যে উঠিয়াছিল, মীমাংসা হইল না। আসামিরা দণ্ড পাইল। প্রজাপক্ষ আরও দুর্বল হইয়া পড়িল। অর্ধাংশ ছাউনি খরচা প্রজারা দিতেছিল; খরচ আর যোগাইতে পারিল না। ছাউনি উঠাইয়া আনা হইল।

যে দিন হোসেনপুর হইতে ছাউনি উঠে, সেই দিন ছাউনি হইতে আমরা থানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, বেলা এক প্রহরের সময়। সেদিন থানায় একটু ঘটার সহিত পানভোজনের আয়োজন হইতেছে, কর্মচারীরা কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ তৈল মাখিতেছেন, কেহ বা তখনও বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমিও তৈল মাখিয়াছি; উঠিব—ঘোড়ার পায়ের শব্দ। সাহেবের বড় ঘোড়া। ঘোড়ায় আসিয়াছে, একজন কুঠির তরফের মহুরি। মহুরি আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সংবাদ দিল, 'কালীবাড়িতে আজ নরবলি হইবে। সাহেব, দেওয়ান ও কাপ্তেন উমোকান্তকে মারণ করিয়া মারিবার জন্য এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তিনিই ব্যবস্থা দিয়াছেন, কালীর সম্মুখে শিশুবলি দিলে তৎক্ষণাৎ সাহেব, দেওয়ানজি ও কাপ্তেন মুখে রক্ত

উঠিয়া মরিবে। নরহরি বাবু সেই বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কোথা হইতে একটা ছোট ছেলেও আনিয়াছেন। আজই—এই দুপুরের সময়ই শিশু বলি হইবে। আপনারা আসুন।' সকলেই স্তম্ভিত। নরবলি! শিশুবলি! দিবা দ্বিপ্রহরে কালীর মন্দিরের সম্মুখে শিশুবলি। থানাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত। এমন কথা ত কেহ কখন শুনেও নাই।

দেখিয়া আসিয়াছি, হোসেনপুরের কালীবাড়ি গ্রামের প্রান্তভাগে। কালীবাড়ির চারিদিক পাঁচিল আঁটা বটে। মন্দিরের সম্মুখে উঠান—চাঁদনী। মন্দিরে এক দেবল-ব্রাহ্মণ আর এক পরিচালক থাকে। জাগ্রত দেবী, সর্বদাই দর্শন প্রণাম করিতে লোক যাতায়াত করে; নরহরি বাবুর কি তেমন সাহস হইবে? যাহা হউক, গায়ের তেল গামছায় মুছিয়া রওনা হইতে হইল। সঙ্গেও বিশ ত্রিশজন লোক চলিল।

সংবাদদাতা বলিয়াছে, 'আজই—আজ এই দুপুর বেলাতেই শিশুবলি হইবে। আর ত বিলম্ব নাই। যদি ঘটনা সত্যই হয়, মতিভ্রমে যদি নরহরি বাবু এই দুর্বুদ্ধিই করিয়া থাকেন, শিশুটিকে রক্ষা করিতে হইবে। প্রাণপণেই চলিতে লাগিলাম। গিয়া দেখিলাম, দ্বার রুদ্ধ। কালীবাড়ির সদর দরজা তালাবন্ধ। নীলকুঠির জমাদার দরজায় বসিয়া আছে, পাঁচিলের চারিদিকেও কুঠির পাইক পিয়াদারা পাহারা দিতেছে। আমরা যাইতেই জমাদার সেলাম জানাইল। এদিকে দেওয়ানজি, আমলারা, কাপ্তেন উমোকান্ত, শেষে সাহেব কালীবাড়ির দরজায় হাজির। জমাদার দরজা খুলিয়া দিল; ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, উঠানের হাড়কাঠের নিকটে একটা শিরোহীন শিশু-শব। রক্তে হাড়কাঠের চারিদিকে ঢেউ খেলিতেছে। অতি ভীষণ দৃশ্য। প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। মন্দিরে সম্মুখে—রোয়াকের উপর নৈবেদ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ অযত্নে পড়িয়া আছে; তাহার নিকটেই স্বয়ং

নরহরি বাবু দুইজন দাসী; তিনটি চাকর ও দেবল—পুরোহিত, ম্লান মুখে বসিয়া আছে। মন্দিরের দরজা খোলা। রোয়াকে উঠিয়া দেখিলাম, দেবীর সম্মুখে বড় একখানা সরার উপর শিশুর মস্তক। রক্তে সরাখানি প্রায় পূরিয়া উঠিয়াছে।—কতক জমিয়া গিয়াছে, কতক এখনও তাজা আছে। সরার পাশেই রক্তমাখা খাঁড়া। বোধ হইল, দুই তিন দণ্ড পূর্বেই এই ভীষণ শিশুবধ—ব্যাপার ঘটিয়াছে।

খুব শীঘ্র শীঘ্র এই সব দেখিয়া শুনিয়া নীচে আসিলাম। সাহেব বলিলেন, 'এখনি গেরেপ্তার কর।—হাতকড়ি দাও। দুঁদে লোক, এখনি লাঠিয়াল সড়কিওয়ালা আসিয়া আসামি ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। আমি পূর্বেই সন্ধান পাইয়াছিলাম। সন্ধান পাইবামাত্র কর্তব্যকার্য বিবেচনায় এদিকে খবর দিয়াছি,—অন্যদিকে আসামি আটক রাখিবারও বন্দোবস্ত করিয়াছি।' সাহেব ভালই করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ পাঁচটি দাসদাসীর সহিত নরহরি বাবুকে হাতকড়ি দেওয়া হইল।

সন্ন্যাসী কোথায়? যাহার মন্ত্রণায় নরহরি বাবু এই পাষাণ হৃদয়ের কার্য করিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসী কোথায়? তাহাকে পাওয়া গেল না। মন্দিরের পরিচালকটিও নাই। কামারও নাই।

সাহেব, উমোকান্তেরই মুখে সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাহাকেই ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উমোকান্ত বলিল, 'একটু নির্জনে আসুন- –গোপনে কথা আছে।'

নির্জনে গেলাম। গুপ্তকথা শুনিলাম। গ্রামের হরি নাপিত আর রাম নাপিত দুই জ্ঞাতি ভাই। দুই ভাই এক বাড়িতেই বাস করে—অথচ মুখ দেখাদেখি নাই। রাম দেশে থাকে না। বিদেশে চাকরি করে। যে কোনও কারণেই হউক; কাল রাত্রে আমি রাম-নাপিতের বাড়িতে ছিলাম। পরের বাড়িতে রাত্রিবাস, নিদ্রার অবসর হয় নাই। শেষ রাত্রে

শুনিলাম, হরি ও তাহার স্ত্রী খুব চুপিচুপি কি কথা কহিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটা বড় বড় কথাও আছে। ভাবিলাম, সাহেবে জমিদারে বিবাদ চলিতেছে, হরি জমিদারের পেয়ারের খানসামা; আমাকে পাইলে হাঙ্গামা করিবে। আমি ঘরে আছি, হয়ত হরি জানিতে পারিয়াছে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বাহির হইব—দেখি একটা ছেলে কোলে লইয়া হরি বাহির হইতেছে। ছেলেটা এক একটু কাঁদিতেছে—তাহাকে চুপি চুপি প্রবোধ দিতেছে। হরি নিঃসন্তান, সে এক ছেলে পাইল কোথা! নামিতে ছিলাম, নামা হইল না। হরি তখন দাওয়ায়। হরির স্ত্রী বলিল, 'বেশ ছেলেটি,—পাইলে মানুষ করিতাম। আহা কোন্ অভাগীর বাছারে।'

হরি ধমক দিয়া বলিল, 'ওই জন্যই ত তোকে সব কথা বলি না। আসল মেয়েমানুষ তুই। তুই আমাকে কোন্‌দিন বিপদে ফেলিবি।' হরির স্ত্রী রাগ করিয়া বলিল, 'আমি তোমাকে দুবেলা বিপদে ফেলিতেছি—দেখিতেছ না? যত দুষ্কর্ম অসৎকর্ম করিবে, আবার রাগ। কোন্ প্রাণে এ কাজ করিবে বল দেখি? একটু মায়াও কি নাই?' হরি বলিল, 'তবে টাকা ফিরাইয়া দে। টাকা ফেরৎ দিয়া বাবুকে বলিয়া আসি যে মশয়, আমার দ্বারা এ সব কাজ হবে না।' হরির স্ত্রী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'তা এমন সোনার বাছাকে কালী ঠাকুরের সাম্‌নে বলি দিয়ে দশ বিশ কুড়ি টাকা কামান চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ভাল।' এমন সময় জীবন ঘোষ আসিল। জীবন বলিল, 'কৈ রে হরে দা, আর দেরি কিসের?' হরি দ্বিরুক্তি না করিয়া—ছেলেটি লইয়া জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গেল। আমিও বাসায় আসিলাম। ঘটনাটা শুনিয়া পর্যন্ত মনের ভিতর কেমন করিয়াছিল, তাই দেওয়ানজিকে বলিয়াছিলাম। শেষ হুজুরের কাছেও বলিয়াছিলাম।

লাশ পাইয়াছেন, আসামি পাইয়াছেন, সুতরাং রামের কন্যাকে লইয়া যেন আর টানাটানি করিবেন না! এই জন্যই গোপনে বলিলাম।'

নরহরিবাবু অবাক। তাঁহার দাসদাসীরাও অবাক্। নরহরি বলিলেন, 'আমরা পূজা দিতে আসিয়াছিলাম। সঙ্গের চাকরেরা পূজার সামগ্রী বহিয়া আনিয়াছিল। পুরোহিতও মন্দিরে ছিলেন না। পরিচারককে মন্দিরে রাখিয়া তিনিও আমার বাড়ি ছিলেন। এক সঙ্গেই সকলে আসিয়াছিলাম। যখন আমরা আসি, তখন সদর দরজা দেওয়া ছিল—খিল দেওয়া ছিল না। প্রবেশ করিয়া দেখি, এই ব্যাপার হতবুদ্ধি হইয়া দেখিতেছি হঠাৎ বাহির হইতে দরজা বন্ধ হইল। হরি প্রাচীরের উপর উঠিয়া দেখিল, কালীবাড়ির চারিদিকে সাহেবের লোকজনেরা পাহারা দিতেছে। করি কি, বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি। এ ব্যাপারের আমরা কিছুই জানি না।'

অন্যান্য দাসদাসীরাও ঠিক এই কথাই বলিল। পরিচারকটি গেল কোথায়? শুনিলাম, তাহার বাড়ি এদেশে নহে। কোন্ দেশে, তাহা কেহ জানে না। ছেলেটিকে কে হাতে করিয়া খুন করিয়াছে, কোন্ নৃশংস এই পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুটির গলায় খাঁড়ার ঘা দিয়াছে, তাহার কিছু প্রমাণ নাই। যাহা হউক, আসামি চালান দিতে হইল।

মকর্দমাটা ঠিক যে ভাবে হওয়া উচিত, ঠিক তেমনভাবে হইল না। খুন করিতে কেহ দেখে নাই, উমোকান্ত ভিন্ন অন্য সাক্ষীও আর কেহ নাই। রাম নাপিতের কন্যাকে অগত্যাই আনিতে হইল। উমোকান্ত তাহার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া হরি ও তাহার স্ত্রী—শেষে হরি ও জীবনের কথোপকথন শুনিয়াছে, সুতরাং নাপিতকন্যা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানে। নানা উপায়ে—তাহার কাছেও সন্ধান লওয়া হইল। সে সতীলক্ষ্মী মেয়ে মানুষ; সে এ সকল কথার এক বর্ণও জানে না।

গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম, পাড়ার এক প্রাণী ও তাহার চরিত্রে সন্দেহ করে না। উমোকান্তকে সে চিনেও না। বড় বিষম সমস্যা।

যদি তেমন পরিচয় থাকে, তবে নরসুন্দর-কন্যা যে বেশভূষাতেই থাকুক না কেন, উমোকান্ত তাহাকে চিনিতে পারিবে। উমোকান্তকে লইয়া স্নানের ঘাটের পথে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলাম। কত মেয়ে-ছেলে স্নান করিতে যাইতেছে আসিতেছে, উমোকান্ত তাহার ভিতর একটি মেয়েকে শনাক্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই পথিকভাবে গিয়া দেখিলাম, মেয়েটি সেনেদের বাড়ি ঢুকিল। এ মেয়ে কায়স্থের মেয়ে। উমোকান্ত বলিল, ভ্রম হইয়াছে। পরদিনও ওইরূপ। বুঝিলাম উমোকান্ত সব কথা সত্য বলে নাই, সন্দেহ জন্মিল। জানিয়া আসিলাম, কাপ্তেনের চরিত্র ভাল নহে। ভদ্রলোকের ছেলে, বাল্যে লেখাপড়া শিখে নাই। গোঁয়ার লোক, সেই খাতিরেই চাকরি। যেখানে বিবাদ বিসম্বাদ মালিমকর্দমা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, সেইখানেই কাপ্তেন উমোকান্ত। সাহেবের তরফে এই কার্যেই উমোকান্ত নিযুক্ত। হোসেনপুর ত্যাগ করিয়া নিজ বাসায় আসিলাম।

পূর্ব মকর্দমায়—যে মকর্দমায় উমোকান্ত, দীনু দত্ত নামক দোহায় ডুবিয়াছিল, সেই মকর্দমাতে যদিও আসামিদের দীর্ঘ দীর্ঘ মেয়াদ হইয়াছে, তথাপি উমোকান্তের চরিত্রে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। এ মকর্দমার এজেহারেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। বড় সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য প্রকার অনুসন্ধানের পথ অবলম্বন করা হইল।

ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের ন্যায় বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আর নাই। মেয়ে-গোয়েন্দা দলে তেমন সকল স্ত্রীলোকও আছে। বামা নামে একটি বছর

একুশ বাইশ বয়সের সুন্দরী—অথচ অসাধারণ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোককে গোটা একদিন ধরিয়া উপদেশ দিয়া হোসেনপুর রওনা করিলাম। বামার গতিবিধি লক্ষ করিবার জন্য আমিও গোপনে রহিলাম। বামার মুখে শেষে এই এই প্রকার ঘটনা শুনিলাম। ঘটনার প্রায় দেড়মাস পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় বামা উমোকান্তের নিজ বাসায় গিয়া উঠিল। সেই রাত্রিটুকু তথায় থাকিবার জন্য স্থান প্রার্থনা করিল। বামা সুন্দরী, অরক্ষিতা, একাকিনী। উমোকান্ত সম্মত হইল। রাত্রিতে উমোকান্ত বামার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বামা আমার আদেশমত বলিল, 'আমি কায়স্থের মেয়ে। হরিহরনগরে আমার বাপের বাড়ি, নাম আমার রঙ্গিণী। বাপের নাম করিব না। আমি নিজ গ্রামের এক দুষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে কলিকাতায় যাইতেছিলাম। সঙ্গে আমার নগদ তিনকুড়ি সাড়ে এগার গণ্ডা টাকা ছিল। টাকা সব পুঁটুলিতে বাঁধা ছিল। গায়ের গহনাও খুলিয়া সেই পুঁটুলিতে বাঁধিয়াছিলাম। কাপড় চোপড়ও সেই পুঁটুলিতে ছিল। পুঁটুলি ছিল, তাহার কাছে। কাল রাত্রে এক গোয়ালাবাড়ি দুজনেই অতিথি হইয়াছিলাম। আজ সকালে আর তাহাকে পাইলাম না। পুঁটুলি লইয়া দুষ্ট লোক কোথায় পলাইয়াছে। পথ চিনি না, নিরুপায় হইয়া চলিতে চলিতে এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আমি যাই কোথা? শ্বশুর কুলে কেহ নাই; বাপের বাড়ি যাইবারও আর মুখ নাই; এখন তবে আমি দাঁড়াই কোথা? না বুঝিয়া এমন কুকর্মও করিয়াছিলাম। কেন বাড়ির বাহির হইলাম।" বামা কাঁদিতে লাগিল।

উমোকান্ত বলিল, 'তা এখানেই কেন থাক না? বাহিরে বাহিরে ঝি পরিচয়ে কেন এই বাসাতেই থাক না? আমিও ব্রাহ্মণ—দোষ কি? যে সব গহনা গিয়াছে, সে সব আবার হইবে,—থাকিবে?'

'থাকিব।' বামার এই সম্মতিতে উমোকান্ত কৃতার্থ হইল। বামা থাকিল। এক দুই করিয়া পক্ষ কাটিল। পনের দিনেই উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয়। সে প্রণয়ের নিকট প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ। উমোকান্ত জীবনের ইতিহাস পর্যন্ত বামার নিকট বলিয়াছে। কোনও কথাই আর বাকি নাই।

উমোকান্তকে প্রজারা জলে ডুবাইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বামা তাহা শুনিয়াছে। অনুমান সত্য; বামার কাছে উমোকান্ত প্রকৃত কথা বলিয়াছে। সে নিজেই প্রজা জব্দের এই অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে। যাহারা প্রজাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহারাই উমোকান্তের গলায় কলশি বাঁধিয়া জলে নামায় এবং তুলিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকে। সে রাত্রে উমোকান্ত খই মুড়ি খায়, দোহার তীরে গাছতলায় উঠিয়া উমোকান্ত তুঁতের জল খাইয়া ভুক্ত খই মুড়ি বমি করে। উমোকান্ত এই বুদ্ধি করিয়া প্রজা জব্দ করিয়া দিয়াছে বলিয়া, সাহেব নিজের সোনার জেবঘড়ি বক্‌শিশ দিয়াছেন।

গাঁজাটা এখন খুবই চলিতেছে। গাঁজা এখন বাবু ভায়াদের সখের নেশা। উমোকান্ত কিছু কিছু গাঁজা খাইত। একদিন সন্ধ্যার সময় উমোকান্ত কাছারি বাড়ি হইতে একমুখ হাসি লইয়া বাসায় আসিয়াছে, জল খাইয়া এক ছিলিম গাঁজা বেশ মনের মত করিয়া সাজিয়া হাতে হুঁকা—সম্মুখে থাক্ দেওয়া দুই শত টাকা, বেশ মনের হরিষে বসিয়াছে; এমন সময় বামা পান দিতে গেল। একবারে অত টাকা দেখিয়া বামা বলিল, 'আজ কাহার খাজনাখানা মারিয়াছ?' উমোকান্ত হাসিয়া বলিল, 'বক্‌শিশ—বক্‌শিশ।'

'কিসের?'

'বলিব না।—গুরুর দিব্যি দেওয়া আছে।'

'গুরুই বুঝি তোমার বড় হইল?'

'ছোট বড়র কথা নয়, ও কথাটা তুমি আর সুধাইও না।' বামা একটু মানিনী হইল। এই সময়ের যে তুকতাক্—বামা তাহাতে নিপুণা ছিল। কৃতকার্য হইল। উমোকান্ত বলিল, 'আদত ফন্দিটা আমার। সাড়ে তের আনীর জমিদারকে জব্দ করিবার জন্য এই ফন্‌টা[৭] আমিই খেলিয়াছি। খবর আসিয়াছে নির্ঘাৎ। নরহরির আর নিস্তার নাই। সে দায়রা দাখিল[৮] হইয়াছে। উকিলের পত্র আসিয়াছে; যেখান থেকে ছেলেটা আনা গিয়াছিল—সেখানেও আর কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই বলিয়া পত্র আসিয়াছে—সাহেব সন্তোষ হইয়া এই দুইশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আমি মালি মকর্দমার সেরেস্তার সর্বময় হইয়াছি। এই দেখ না—সে সকল চিঠি এখন আমারই জিম্মা।'

'ছেলেটা পাওয়া গেল কোথায়? কে তাকে তোমাদের হাতে দিয়াছিল?'

'সে অনেক কথার কথা।'

'বলই না শুনি।'

'ছেলেটা চালান আসিয়াছিল, কৃষ্ণপুর হইতে। দেওয়ান রামলোচন রায় কৃষ্ণপুরের কুঠীতে থাকেন। আমাদেরই লোক তিনি। সেই গ্রামের কীনু বাগ্‌দীর ছেলে পথ দিয়া যাইতেছিল, দেওয়ানজির সাতোয়াল হরে হাড়ি তাহাকে ভুলাইয়া আনে।— সন্দেশ মিঠাই খাওয়াইয়া সেদিন কুঠিতে রাখে—রাত্রে রাত্রে এখানে চালান আসে। থাকে—বড়ি গুদামে। প্রায় একমাস আগে আমরা সন্ধান পাইয়াছিলাম, যে, নরহরির ভাই বাগ্‌পাট্টার নায়েব—দেওয়ান হইয়াছে; সেই জন্য নরহরি বাড়ি আসিয়াই একবার জাঁকাইয়া কালীপূজা করিবে। এ কথা পূর্বেই জানাজানি হইয়াছিল। তখন হইতেই এই যুক্তি আঁটা ছিল।

সময় শিরে যুক্তিটা বড় কাজে লাগিয়া গেল।'

'তা লাগুক, কিন্তু কৃষ্ণপুরে ত বাগ্‌দী নাই। তুমি মিথ্যা গল্প রচিয়া বলিতেছ। সেই গাঁয়ে আমার মামার বাড়ি। রামলোচন দেওয়ানকে আমি জানি—কতদিন আমাদের বাড়ি তিনি নিমন্ত্রণে আসিয়াছেন। সেখানে ত বাগদী নাই।'

'নাই। আলবৎ আছে।' এই বলিয়া উমোকান্ত জেব হইতে এক তাড়া কাগজ বাহির করিল। তাড়া হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বলি, 'এই শোন! রামলোচন দেওয়ান নিজ হাতে কি লিখিয়াছে, শোন।—

মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীযুক্ত দেওয়ানজি মহাশয়ের ঁরাজ রাজলক্ষ্মী নিয়ত ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতেই অত্রানন্দ পরং সম্প্রতি নিবেদিতেছি যে অত্রস্থানের সারেওয়ার গোল মিটাইয়া দিয়াছি সে জন্য ভাবিত নাহিবেন শ্রীকানু বাগদী অত্র স্থান হইতে হরিপুরে প্রাণশঙ্কর বাবুজীর জমিতে উঠিয়া যাওয়ায় আমি সেই ভিটায় অন্য প্রজা পত্তন করিয়াছি অত্র কুঠীর মাতোয়াল* হরি হাড়ির ইনামের বিষয় বিবেচনা করিবেন ছোটলোককে বিশ্বাস করিতে নাহি অত্র পত্রের মর্ম শ্রীযুক্ত উমোকান্ত রায় মহাশয়কে বিদিত করিবেন ও অভয় দিবেন, এবং শ্রীযুক্ত কর্ত্তা সাহেবকে বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইবেন। নিবেদন ইতি।'

'শুনিলে? এখন বিশ্বাস হইল ত?' 'তা থাকে যদি ত উত্তর পাড়ায় আছে। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় বাগ্‌দী নাই। যা হোক্ খুব বুদ্ধি তোমার। আচ্ছা, রাতদিন কালীবাড়িতে লোক আনাগোনা করে, তার মধ্যে এ কাজ কি বুদ্ধিতে সার্বাড় পড়িল?'

'দেবল ঠাকুরকে কিছু সহাইয়া সেদিন সকালেই নরহরি বাবুর

বাড়িতে পূজার সামগ্রী আনিতে পাঠান হইয়াছিল। পরিচারকটি ভীতু লোক, তাহাকে তিনশ আর পথখরচ দিয়া সেইদিনই দেশে পাঠান হইয়াছিল। সকাল হইতেই কুঠির লোকজন বাড়ির বাহিরে হল্লা করিতে থাকায় কেহ সেদিকে সাহস করিয়া আইসে নাই। আমি, মধু বিশ্বাস, আর দিগম বেহারা; আমরা তিনজনে ভিতরে থাকিয়া কাজ সাবাড় দিয়া চলিয়া যাই। পাইকেরা পাহারায় থাকে। একটু পরেই নরহরি বাবুর লোকজন—বাবু নিজে; যেমন প্রবেশ অমনি দরজা বন্ধ!'

'আচ্ছা বুদ্ধি বটে। তা ছেলেটা কাঁদে নাই?' 'কাঁদিবে কি? মধু ছোঁড়ার মুখ চাপিয়া ধরিল, দিগম্ হাড়িকাঠে ফেলিয়া পা টানিয়া ধরিল—আর এক কোপ! এক কোপেই ফর্সা।'

অন্যান্য পাঁচ কথার পর আহারাদি হইল, পরে শয়ন। একটু পরেই সেই চিঠির তাড়াটা লইয়া বামার প্রস্থান।

আমি যেখানে লুকাইয়া ছিলাম, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তথায় বামা গিয়া হাজির। তাড়াটা আমার দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াই বামা বলিল, 'বাবা বক্‌শিশ কর—আসামি পাইয়াছি।' এই বলিয়া বামা পূর্বে যে সকল কথা শুনিয়াছিল, ওই সকল কথা বলিল। পত্রগুলিও পড়িলাম। সব খবরাখবর ছিল, প্রভাতের মধ্যেই লোকজন আসিয়া পড়িল। প্রভাতেই উমোকান্তকে গেরেপ্তার করিলাম। হরিপুরে কীনু বাগদীকে আনিতে লোক গেল; এদিকে আমি নিজে গিয়া দেওয়ান রামলোচনা আর হরি হাড়িকে ধরিয়া আনিলাম। হোসেনপুর সরগরম হইয়া উঠিল।

কীনু আসিয়া ছেলে হারানোর কথা বলিল। হরি হাড়িকে একটা ছেলে লইয়া যাইতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষী মিলিল। এদিকে চিঠিতেই কার্য শেষ। রামলোচনের স্বহস্তের পত্র আর কোনও সাফাই জবাব টিঁকিল না। নরহরি বাবু মুক্তি পাইলেন। উমোকান্ত শেষ শাস্তিই[১০]

পাইল। রামলোচন আর হোসেনপুরের দেওয়ানের কারাদণ্ড এবং হাড়ির দীর্ঘ কারাবাসের বিধান হইল। বামাকে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করা হইল। আমিও কিছু পাইলাম।

জলেডুবীর মকর্দমার সাক্ষীরাও মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অপরাধে ফাটকে গেল।

টীকা

১. **কানসারণ**: কনসার্ন। Concern। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমোদিত ব্যবসায়িক কুঠীর অধীনস্থ এলাকা। কানসারন বা কনসারনের উদাহরণ- স্বরূপ কৃষ্ণনগরের নিকটস্থ কাঠগড়া কনসারণের উল্লেখ করা যায়। এই কনসারনের অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলে নীলবিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় ১৮৫৯ সালে।

২. **মেষ্টর**: মিস্টার। ইংরেজি ভাষায় ভদ্রলোকের আখ্যা। বাংলা প্রতিশব্দ 'শ্রীযুক্ত' বা 'মহাশয়'।

৩. **জেরবার**: নাকাল। বিপর্যস্ত।

৪. **মাল আখেরী**: কাল-অন্তিক মজুত। Closing Stock।

৫. **দোহা**: দহ। বড়ো জলাশয়।

৬. **খইমুড়কি**: খই এবং মুড়কি। ধান ভেজে তৈরি মুড়ি-জাতীয় খাদ্য খই। মুড়কি হল চিনির রসে বা গুড়ে জাল দিয়ে শুকনো করা খই। খই এবং মুড়কি গ্রাম বাঙলার নিয়মিত জলখাবার।

৭. **ফনটা**: Fun-টা। অর্থাৎ মজা বা চালাকি।

৮. **দায়রা দাখিল**: দায়রা আদালতে, অর্থাৎ ফৌজদারি আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত।

৯. **মাতোয়াল**: 'মাতোয়ালি' বা 'মুত্তাওয়ালী'। মুসলমানদের ধর্মীয় কারণে বা জনহিতার্থে প্রদত্ত সম্পত্তি বা অর্থের তত্ত্বাবধায়ক। এক্ষেত্রে কৃষ্ণপুরের কুঠির তত্ত্বাবধায়ক বা ব্যবস্থাপক বোঝানো হয়েছে।

১০. **শেষ শাস্তি**: মৃত্যুদণ্ড।

নিস্তার

তপ্তঘৃতে মানুষ ভাজা! মশালে মানুষ খুন!

নিশি শেষেই সংবাদ পাইলাম, জীবননগরের রাধানাথ ঘোষের বাড়িতে ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতেরা যথাসর্বস্ব—সে যথাসর্বস্বের মূল্য অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা লইয়া নির্ভয়ে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ রাধানাথকে তপ্ত ঘৃতে ভাজিয়াছে। প্রবীণা গৃহিণীর দেহ ধুনা পাটে গঠিত মশালের আগুনে পোড়াইয়াছে! উভয়েই এখন মৃত্যু-পথের পথিক হইয়াছেন। পাড়ার লোকে শোরগোল করিয়াছিল, লাঠি সোটা লইয়া ডাকাতদমনে আসিয়াছিল, তাহাদিগেরও কেহ কেহ আঘাত পাইয়াছে। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র জীবননগরে পৌঁছিলাম। গিয়া দেখি, বাহির বাড়িতে রাধানাথ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, গৃহিণীর আর্তনাদে অন্তঃপুরে হাহাকার উঠিয়াছে। লোকজনে রাধানাথের সদর মফঃস্বল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, ডাকাতি বটে। পোড়া মশাল স্থানে স্থানে ছিটান আছে, এখানকার জিনিস সেখানে, সেখানকার লেপ বালিশ ওখানে, ওখানকার তৈজস এখানে; চারিদিকে ছত্রকার। কিছু নাই। একে টাকার শোক—তাহাতে দহনের যন্ত্রণা; কর্তা গৃহিণীর স্বর্গারোহণের আর বিলম্ব নাই।

যন্ত্রণা ও আর্তনাদের মধ্যেই আমি অগত্যা রাধানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোনও সন্ধান দিতে পার? কাহাকেও কি সোভে' হয়? মানুষ চিনিতে পারিয়াছ কি?'

'না—একজন—একজনকেও না। মরি আমি—প্রাণ যায় আমার!

হায় হায়, শেষে জ্বলে পুড়ে মরিতে হইল?' বৃথা। রাধানাথ মানুষ চিনিতে পারে নাই। গৃহিণীও না। বাড়ির প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেই বলিল, না। রাধানাথের একটি পৌত্রী, বয়স ৮/৯ বৎসর; সে বলিল, 'আমি একজনকে চিনি। ডাকাত মিন্সেদের মধ্যে নাপিত জেঠীর জামাই ছিল। আমি কালও সৈরুবীর সহিত খেলা করিতে গিয়া জেঠীর জামাইকে দেখিয়া আসিয়াছি। যখন সে আমাদের উত্তর ঘর হইতে লাফাইয়া উঠানে পড়ে, তখন তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া গিয়াছিল। পাতকুয়ার পাশের ওই কচুবনে আমি আর মা লুকাইয়াছিলাম। সেই সময় আমি দেখিয়াছি।' বাড়ির পরিবারদের মুখে শুনিলাম, নবীন নাপিতের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধুকে রাধানাথ ঘোষের পৌত্রী পাটেশ্বরী, নাপিত জেঠী বলিয়া ডাকে। গ্রাম্য সম্পর্ক আছে। সন্ধান পাইলাম, নাপিত জেঠীর জামাই কেশব আজ তিন চারদিন হইল শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল, অদ্য এই প্রাতে বাড়ি চলিয়া গিয়াছে। অন্য কোনও প্রমাণ নাই, এখন বালিকার প্রমাণই মূল্যবান্ বলিয়া ধরিতে হইল।

যদি কেশব এই ডাকাতির ভিতর থাকে, তবে নবীন সে কথা জানে। নবীনই হয় ত সন্ধান দিয়াছে। এ বিশ্বাসের আর এক বলবৎ কারণ, রাধানাথের এক জ্ঞাতি ভাই—তিনি রাধানাথের চণ্ডীমণ্ডপে বসা-উঠা করেন; তিনি বলিলেন, আজ তিন চার দিন হইল, ছেলের বিবাহ দিব বলিয়া নবীন রাধানাথের নিকট টাকা কর্জ করিতে আসিয়াছিল। নবীন পূর্বে যে টাকা কর্জ লইয়াছিল, তাহা আজিও পরিশোধ করে নাই বলিয়া, রাধানাথ তাহাকে টাকা দেন নাই।

নবীনের বাড়ি খানামসারা করিলাম, কিছুমাত্র মালামাল মিলিল না। তবে পাটেশ্বরীর সই সৌরভী বলিল, কেশব ছিল। বাড়ির আর

সকলেও বলিল, কেশব ছিল। কেশবের বাড়ি দুইক্রোশ দূরে বিষ্ণুপুর। নবীন কোনও মতে জামাইকে সতর্ক করিতে না পারে, এমন বন্দোবস্ত করিয়া বিষ্ণুপুর চলিলাম। পৌঁছিলাম, অপরাহ্নের পূর্বে। কেশবের মেটে বাড়ি, তবে বেশ পরিষ্কার পরিছন্ন। বাহিরে একখানি ছোট ঘরও আছে। আমি কেশবকে ডাকিলাম। নবীনের সহিত পরিচয় আছে—তুমি নবীনের জামাই তাহাও জানা আছে, আজি রাত্রিতে তোমার বাড়ি থাকিব; কেশবকে এ কথা বলিলাম। সম্মত হইল। অদ্যই প্রাতে সে শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছে, এ কথাও বলিল।

বসিয়া আছি, সন্ধ্যা তখনও হয় নাই; বাড়ির ভিতর হইতে একটি কুড়ি একুশ বৎসর বয়সের যুবতী স্ত্রীলোক বাহিরে আসিল। বেশ চেহারা,—পরিধানে ফরসা কাপড়, মুখে হাসি। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁ গা, তুমি কে গা?'

'আমি কেশবের বোন।'

'তোমার কোমরে ও কিসের চুপড়ি?'

'বাঁশের চুপড়ি।'

কেশবের ভগ্নীর কোমরে একটি ছোট কাপড় ঢাকা আলতা চুপড়ি ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাপড় ঢাকা কি?'

কেশবভগ্নী অপাঙ্গে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, 'যাহা কাপড় ঢাকা আছে, তাহা পরে বলিব। তুমি ত আজ রাত্রে আমাদের বাড়ি থাকিবে?' এই বলিয়া সে মুচকি হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যাও হয়।

গৃহস্থের কন্যা; নাপিত হইলেই কি এত বেহায়া হইতে হয়? অপরিচিত আমি, আমার সঙ্গেই যখন এত রসিকতা, তখন কেশবের ভগ্নী দুশ্চরিত্রা বটে। চুপড়ির প্রতি সন্দেহ হইল। গাড়ু লইয়া বহির্দেশ গমনের অছিলায় উঠিলাম। কেশব তখন বাড়ির ভিতর।

বাড়ির নিকটেই এক বড় আম গাছ। গাড়ুটা তাহার অন্ধকারে লুকাইয়া রাখিলাম। দূরে দূরে পশ্চাৎ গিয়া দেখিলাম, কেশবের ভগ্নী এক গৃহস্থবাড়ি ঢুকিল। সেটা স্যাক্‌রাবাড়ি। কেশবের ভগ্নী দোকান ঘরের সম্মুখ দিয়া স্যাকরা বাড়ি ঢুকিতেই একটা লোক দোকান হইতে উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেল। আমি তখন এক বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে লুকাইয়া আছি।

দুই দিকে বাঁশবন, ভিতর দিয়া স্যাক্‌রাবাড়ি যাইবার রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়া একটা লোক হন্ হন্ করিয়া আসিল, আমি যেখানে লুকাইয়া আছি—তাহার সম্মুখেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইল, বিপরীত দিক হইতে একটা লোক আসিতেছে দেখিয়া লোকটাও বাঁশের ঝাড়ের নীচে চুপ করিয়া বসিল। চলন্ত লোকটা চলিয়া গেল। কেশবের ভগ্নী স্যাক্‌রাবাড়ি হইতে বাহির হইল। বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল যে লোকটি লুকাইয়াছিল সে সহসা বাহির হইল; স্ত্রীলোকটির হাত ধরিয়া বলিল, 'নূতন নূতন তেঁতুল বিচী, পুরানো হলে বাতায় গুঁজি। বটে? এখন হরের সঙ্গে যে ভারি পিরিত। আমরা বুঝি কেউ নয়?'

'রাখ্‌লা, সর্ সর্—রাত হয়েছে। পথে ঘাটে ও কি? বাড়িতে আবার কুটুম্ব এয়েছে।'

'কুটুম্ব সেবার সময় ত এখনও হয়নি, এই ত সবে সান্ধ্য বেলা? দিবি না কিছু?'

'এই নে—কাল দশটা টাকা দিস', এই বলিয়া 'রাখ্‌লার'[২] হাতে কি দিল। সে পাপিনী নাপ্‌তিনীকে সেই স্থানেই কি বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। অনন্তর পাপিনী ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলিল। আমিও বাহির হইলাম। আমতলা হইতে গাড়ু লইয়া কেশবের সদরে আসিলাম। দেখিলাম, কেশব বসিয়া আছে। অনেক কথাবার্তা হইল,

পাকশাক হইল, আমিও নাপিত, ঘরেই আহারাদি করিয়া, বাহিরের ঘরে শয়ন করিলাম।

চুপড়ি গেরেপ্তার করিলে যে মাল পাওয়া যাইত, ইহা যেন বেশ বুঝিলাম। পাপিনী চুপড়িতে করিয়া যে গহনাগুলি হরি স্বর্ণকারকে দিয়া আসিল, ইহা নিজেও বেশ বুঝিলাম। পাপিনীর পূর্বপ্রণয়ী রাখালের কথাতেও সে আভাস মিলিল। রাখালকে হয় ত কিছু গহনা দিল। নিদ্রা হইল না, উঠিলাম। শয্যায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

একটা পাগল গান গাহিতে গাহিতে কেশবের বাড়ির সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। কতদূর গিয়া আবার ফিরিল। কেশবের দরজায় ঘন ঘন আঘাত করিয়া তাহাকে তুলিল। কেশব মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেই পাগল গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল;—

একটা কাকের পাছু ফিঙ্গে লেগেছে
ফিঙ্গে উড়ে উড়ে কাকের বাসায় বোসেছে।
ডিম্ ভাংতেছে, মজা লুট্‌তেছে;
ঠোকর মেরে উড়ে ব'স্‌তেছে।

এই গীত গাহিতে গাহিতে পাগল চলিয়া গেল। আমি নিদ্রিত, এই বুঝিয়া কেশব দরজা দিয়া বাড়ির ভিতর গেল। কথার আওয়াজে বুঝিলাম, বাড়ির লোক এখনও জাগিয়া আছে। আওয়াজের ভিতর পুরুষের আওয়াজও পাইলাম। আসিয়া অবধি অন্য পুরুষ কাহাকেও দেখি নাই। সন্দেহ হইল; খুব সাবধানে বাহিরের ঘরের আধভাঙা ছোট পাশ দরজাটি খুলিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, উত্তরদ্বারী ঘরের দাওয়ায় পাঁচ সাতটি লোক। অন্ধকার রাত্রি বলিয়াই রক্ষা; খুব সাবধানে গিয়া দাওয়ায় বাম দিকে খুব কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলাম। কথাবার্তা বেশ শোনা যাইতে লাগিল।

একজন বলিল, 'নিতে পাগলা তবে ত ঠিক সন্ধানই বলে গেছে। নবীনের বাড়িতে পুলিশের পাহারা; নিতেকে যেই পাঠিয়াছিলাম, সেই ত খবরটা পাওয়া গেল। যা হোক্, এখন উপায়?'

২য়। 'উপায় ভাবার আর সময় নাই। হাতে যখন পেয়েছি, তখন ছাড়্‌বো না। ওস্তাদিটা একবার দেখান চাই। এবার যদি ছেড়ে দাও; একজনও বাঁচ্‌তে পারবে না। বেটা ভারি তয়ের।'

৩য়। 'তয়ের নয়? দেখ দেখি, কেমন ভাবসাব কোরে এসে অতিথি হয়েছে। যার শিল তার নোড়া, তারই ভাঙবে দাঁতের গোড়া; বেটার এই মতলব। মতলবটা ঘুরিয়ে দাও।' অন্য একজন গম্ভীরভাবে বলিল, 'দেশের মধ্যে এ কাজটা ভাল হয় নাই। আমি তখনই নিষেধ করিয়াছিলাম। নবীন কেবল এটা করালে। তোর টাকার দরকার ছিল ত আমাকে কেন বল্লি না? তাতেও ভাবনার কথা কিছু ছিল না।'

২য়। সে সব কথা আর নয়। যা হবার—তা হয়েছে; এখানকার কথা কও। রাত আর বেশি নাই।

১ম। 'এখানকার কথা আর কি?—সাবাড় করে দাও। ফিঙ্গেটাকে গলা টিপিয়া বিনাশ কর। বেশি লোকের দরকার নাই; গোবিন্দ, দীনে আর রামচরণ; তিন জনেই পার্বে। ঘুমন্ত মানুষ সাফ করিতে আর কতলোক চাই?' যুক্তিমাত্র তিনটি লোক উঠিল, নিঃশব্দে দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িল। সাবধানে কেশবের বাহিরের ঘরের দিকে গেল। বুঝিলাম, আমাকে হত্যা করিতেই ইহারা চলিয়াছে। ভয় হইল। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সেই ঘরের চাঁদড়ে° উঠিয়া বসিলাম। তৎক্ষণাৎ একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'শালা পলাইয়াছে।'

'পলাইয়াছে? সন্ধান পেয়েছে বুঝি? নিতে পাগলা কি কিছু বলেছে না কি?'

'কিছু না। গান ভিন্ন সে একটা কথাও বলে নাই।' চিনিলাম, এ কেশবের গলা। বুঝিলাম, নিতে পাগ্‌লাই গীত গাহিয়া ইসারায় আমার আগমনবার্তা জানাইয়াছে। স্পষ্ট বুঝিলাম, পাগলটা এই ডাকাতদলেরই গুপ্তচর।

তখনি দশ বারটা মশাল জ্বালিয়া সকলে আমাকে খুঁজিতে লাগিল। গ্রামের বাহিরেও লোক গেল। পাতিপাতি অনুসন্ধান; সশঙ্কিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। গা কাঁপিতে লাগিল। পূর্বদিক ফরসা হইল। অনুসন্ধানীরা সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিল, আমিও অবসর বুঝিয়া নামিয়া অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই বনে বনে দৌড়। ভাল করিয়া রৌদ্র উঠিতে না উঠিতেই জীবননগরে আসিয়া তখনি আবার বিষ্ণুপুর আসিলাম। বেলা দশটা। আসিয়াই গেরেপ্তার। হরি স্বর্ণকার ও বাঁশঝাড়ের অন্ধকারের সেই গুপ্ত-প্রেমিক রাখালকেও গেরেপ্তার। গোবিন্দ, দীনে আর রামচরণ, নাম তিনটা মনে ছিল, গ্রামের দুই গোবিন্দ, তিন দীনে আর এক রামচরণ ধরা পড়িল।

এখনও গহনাগুলি হরি গালাই করিয়া উঠিতে পারে নাই। অনেকগুলি এমন গহনা মিলিল, সেগুলির মালিকের নাম হরি করিতে পারিল না। রাখালের বাড়িও অনুসন্ধান করিলাম, মাত্র একগাছি বালা মিলিল। রাখালও জাতিতে স্বর্ণকার।

রাখালকে গোপনে আনিয়া বলিলাম, 'তোমাকে সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারি, যদি সত্য কথা বল।' গতকল্য বাঁশবনের অন্ধকারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিলাম। রাখাল সম্মত হইল। বলিল, 'হরির সহিতও নিস্তারের প্রসক্তি আছে। মালামাল

এখন সেইই গালাই করে। আমি কখনও গালাই নাই। ভালবাসা ছিল। এখনও কিছু কিছু আছে। তখন তখন নিস্তার ভালবাসিত, টাকাটা সিকেটা প্রয়োজনমত দিত। গহনা কখনও দেয় নাই। কেবল কালই দিয়াছিল। ডাকাতিও ইহারা করে জানি, গ্রামের লোকও জানে। গ্রামে কখনও ডাকাতি হয় নাই, হইবেও না; এ জন্য গ্রামের লোক ইহাদের কিছু বলে না।' কোন্ গোবিন্দ, কোন্ দীনু; রাখালের শনাক্ত মত সেই গোবিন্দ ও দীনুকে রাখিয়া, বাকি গোবিন্দ দীনুদের ছাড়িয়া দিলাম। রাখালের কথামত আর তিনটি লোককেও গেরেপ্তার করিলাম। তাহাদের গৃহেও অনেক বে-শনাক্ত জিনিস মিলিল। সে সকল জিনিস তাহারা কোথায় পাইয়াছে, বলিতে পারিল না। মায় নিস্তারিণী ১১ জন আসামি লইয়া আবার জীবননগরে আসিলাম। গহনার অনেকগুলি রাধানাথের পরিবারেরা শনাক্ত করিল, কতক গহনা শনাক্ত হইল না। সে সকল অন্যস্থানের গহনা। আসামি চালান দিলাম।

নিস্তারিণী সমস্ত কথা হাকিমের সম্মুখে বে-কবুল গেল। 'ঘটনা কিছুই ঘটে নাই; দারগাবাবু আমাদের বাড়িতে গিয়া দুই দিন ছিলেন; দাদাকে মারপিট করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত প্রসক্তি করিলে দাদাকে ছাড়িয়া দিবেন বলিয়া প্রলোভন দিয়াছিলেন, আমি ভালমানুষের মেয়ে—দারগার কথা শুনি নাই, তাই আমাকে চালান দিয়াছিল।' কুলটার অকথ্য কথা নাই।

নবীন, জামাতার অনুকূল প্রতিকূল কোনও কথাই বলিল না। সে যে এ ডাকাতিতে লিপ্ত তাহা বুঝিলাম, তথাপি সে কথা প্রমাণে দাঁড়াইল না। ছাড়িয়া দিতে হইল।

নিস্তারিণীর ফাটক রদ হইল না, তবে অল্প দিনের জন্য। বাকি

আসামিদের গড় সাত বৎসর হিসাবে কঠিন শ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইল। অল্পদিন পরে বৃদ্ধ রাধানাথ মারা গেল, গৃহিণী সারিয়া উঠিলেন। গায়ে কেবল দাগ থাকিল।

টীকা

১. **সোভে**: অধ্যাপক সুকুমার সেন অর্থ নির্ণয় করেছেন, 'তদন্ত'। কিন্তু প্রয়োগ এবং ব্যবহারে 'সন্দেহ' মনে হওয়া স্বাভাবিক।

২. **রাখলার**: 'রাখালের'। ব্যঙ্গার্থে এবং তাচ্ছিল্যার্থে অথবা স্নেহার্থে উক্ত।

৩. **চাঁদড়ে**: চালার নীচস্থ মাচা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাঁশ এবং দরমা দ্বারা নির্মিত।

মামুদ হাতি

জলপন্থী ঠগীর অদ্ভুত বিক্রম

সিরাজগঞ্জের[১] প্রধান আড়তদার জানকীবল্লভ সিংহ রায় গত ৫ই ভাদ্র পাঁচ কিস্তি পাট রপ্তানি দিয়াছিলেন; বেচা সাবাড় করিয়া টাকাকড়ি লইয়া কিস্তির সাংড়া[২] দেশে ফিরিতেছিল, চড়ন্দার[৩] ছিলেন, রামধন রায়। টাকা লোহার সিন্দুকে ছিল। সবই নগদ। দশ হাজার সাতশত একাত্তর টাকা মূল্য, তন্মধ্যে একাত্তরটি টাকা পথখরচ বলিয়া বাহিরে রাখিয়া বাকি টাকা সবই লোহার সিন্দুকে রায় মহাশয় স্বয়ং গনিয়া গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। ২৯-এ তারিখের রাত্রে টানের মুখে নৌকা ধরিয়া মাঝিরা দামুকদেয়াড়ের[৪] দিকে আসিতেছিল, সোনাপুরের নীচে একখানা ছিপ্ কিস্তির পাশে ভিড়ে এবং একটা লোক চকিতে কিস্তির উপর লাফাইয়া পড়ে। দ্বিতীয় লাফে লোহার সিন্দুকটা টানিয়া বাহির করিয়া, তৃতীয় লাফে ছিপে তুলিয়া লইয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়। সঙ্গে নৌকার মাঝিরা আগ পাছ হইয়া পড়িয়াছিল, টাকার নৌকার মাঝিরাও অন্যমনস্ক ছিল, ঠগেরা চকিতে কাজ সারিয়া চলিয়া যায়। প্রথম এতেলা[৫] মাঝিরা ও রায়মহাশয় এইরূপ দেন।

কসবার বিপিনবাবুর মত বলবান্ লোক পাবনা জেলায় নাই। স্থানীয় পুলিশের পীড়নে, প্রথম এতেলা ঠিক রাখিবার জন্য, রায় মহাশয় শেষে বিপিনবাবুর নাম করেন। 'তাঁহাকে চিনিয়াছি—তিনিই একা লোহার সিন্ধুক আপনার নৌকায় তুলিয়া লইয়াছেন, দেখিয়াছি,' রায়মহাশয় এ কথা বলিলেন। বিপিনবাবু ঘটনার দিন মাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ

করিয়াছিলেন, রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া লোকজন খাওয়াইয়া ছিলেন,—তাঁহাকে ধরা কঠিন। এদিকে দশহাজার টাকা লুট!—তদন্ত করিতে না পারিলেও কলঙ্ক। নিযুক্ত হইলাম।

জানকীবাবুর সেরেস্তার খাতায় দেখিলাম, লোহার সিন্দুকের ওজন দুই মণ চার সের, মূল্য ৯৫ টাকা। টাকাসহ ওজন সুতরাং সাড়ে পাঁচ মণ। এত বড় ভারি জিনিস,—বিশেষ লোহার সিন্দুক, তাহা কি একা এক নৌকা হইতে অন্য নৌকায় লওয়া যায়? যদি শ্রাদ্ধের কথায় মকর্দমা না কাটে, বিপিনবাবুর চেহারা দেখিলেই এ সকল সংশয় মিটিবে। কসবায় চলিলাম।

বিপিনবাবু অতি সজ্জন। আদরযত্ন করিলেন, নিজের শরীরে যে কিছু বল আছে তাহাও বলিলেন। সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'তা আমি পারি। সাড়ে পাঁচ মণ লোহার সিন্দুক আমি বোধ হয় এক নৌকা হইতে নৌকান্তরে আনিতে পারি; কিন্তু জানকীর নৌকা আমি লুঠ করি নাই। তেমন বংশে আমার জন্ম নয়।'

কথায় বিশ্বাস হইল, সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকও হইল। বিপিনবাবুরই একটা সিন্দুক কোন গতিকে সাড়ে পাঁচ মণ ভারি করিয়া লইয়া বিপিনবাবুর বল পরীক্ষা হইল, বিপিনবাবু কৃতকার্য হইলেন। এ ক্ষেত্রে বিপিনবাবুকে ছাড়া উচিত নহে জানি, তথাপি ছাড়িলাম। বিপিনবাবু যে নির্দোষ তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অকুস্থল সোনাপুর। সোনাপুরে চলিলাম। খুব দীন বেশেই চলিলাম। গ্রামের প্রান্তভাগে এক তাড়ির দোকান। সেই দোকানে গিয়া দোকানদারকে আলেকম্-আদাবঁ জানাইলাম, হুঁকা পাইলাম। আমিও ওই ব্যবসায়ী, ঢাকা জেলায় আমারও একখানা তাড়ির দোকান আছে, সহরে ঘর, দেশে যাইতেছি। এইরূপ পরিচয় দিলাম। স্থান পাইলাম।

অনেকগুলি তেড়েল[৭] জুটিল। কত লোক গড়াগড়ি দিল। কত লোক বমি করিল। রাত্রি যখন প্রায় দ্বিপ্রহর, তখন একটু নির্জন হইল। তাড়িখানায় তখন দোকানদার আর একটি মাত্র লোক। উভয়ে শেষ কাটের ভাল জিনিসটুকু এখন খাইতেছে।

গুড় আর জল দিয়া, দোকানদার তাহার রান্নার চালার ভিতর একখানা দরমা দিয়াছে, বলিয়াছে, 'তুমি এখন ঘুমাও। অনেক রাত্রে রাঁধিয়া খাওয়াইব।' আমি রান্নার চালাতেই আছি, তবে ঘুমাই নাই। তেড়েলদের দিকে লক্ষ করিয়া আছি।

দোকানদার বলিল, 'আরে ভাই চলে না। বেচাকেনা নাই, দেশের ছিরি নোকেরা দানা অভাবে মারা যায়। আর দেরি কেন? মামুদকে বলে কেন বক্‌রাটা[৮] সেরে নে না।'

'আমিও তাই বলি। কালই আমি যাব।'

'একটু সকাল সকাল গেলে হয় না? অনেক পথ, ফিরে এসে আবার দোকান খুলতে হবে ত?'

'তারাপুর—এইত হাতের গোড়ায়। দেড় ক্রোশ আবার পথ। এদিকে ত আর গোল নাই?'

'কিছু না। যা শত্রু পরে পরে, বিপিন না কে এক বেটা—সেই এখন বাঁধা পড়িয়াছে। আমাদের ধরে কোন শালা? মামুদ বলে, কুচ পরওয়া নেই।'

'কুচ পরওয়া নেই।' সহাস্যমুখে এই কথা বলিয়া দোকানদার উঠিল। লোকটিও চলিয়া গেল।

দোকানদার ডাকিল, রাঁধা-বাড়া করিল, আহারাদি করিলাম। প্রাতে উঠিয়াই তারাপুরে চলিলাম। মহম্মদের কোটা বাড়ি। পূর্বে মহম্মদের পিতা বড়লোক ছিলেন, মহম্মদের এ পৈত্রিক বাড়ি। জাঁক পসার

আছে। দেউড়ি আছে। দেউড়িতে দ্বারবান্ আছে। সব দেখিয়া শুনিয়া নিকটবর্তী থানায় আসিলাম।

তারাপুর পদ্মার তীরে। আমরা ফিরিতেছি, ভদ্রলোকের মত। পুলিসের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। পদ্মার তীর দিয়াই পথ, সে পথে আসিতেছি। গ্রামের নিকটে এক ব্যক্তি মাছ ধরিতেছে, দেখিতে দেখিতে যাইতেছি। দেখিলাম, লোকটা ছিপের দিকে বড় একটা চাহিতেছে না, চাহিতেছে রাস্তার দিকে। একবার রাস্তার এদিক—একবার ওদিকে চাহিতেছে, আর মাঝে মাঝে ছিপ তুলিতেছে আর ফেলিতেছে। এমন অন্যমনস্ক হইলে ত মাছ ধরা যায় না। এত রৌদ্রে লোকটা ও করিতেছে কি? নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত বেলায় কি মাছ ধরিতেছ হে।' লোকটা নীরব। নিকটে গেলাম, লোকটা যেন ভয়ে জড়সড় হইয়া উঠিল। মাছ ধরিতেছে, তাহাতে এত ভয়? লোকটা বসিয়াছিল, হাত ধরিয়া তুলিলাম। একেবারে আড়ষ্ট। পা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'আমি কিছু জানি না মশায়, শুধু শুধু মাছ ধরিতেছি।'

'তোর মাছ কৈ?'

'পাই নাই।'

'ব্যাটা বদমায়েস—তুই সব জানিস্। বলবি ত বল, তা না হলে তোরে জলে ডুবিয়ে মারব। হরকিষণ?'

তৎক্ষণাৎ একজন পদাতিক ছুটিয়া আসিল। লোকটা আর নাই। কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, 'আমি কেবল চৌকি দিতেছি।'

'চৌকি দিতেছিস বই কি? তুই সব জানিস।'

'না কর্তা, কিছু জানি না। জলের ভিতর আছে এই জানি, এইখানে বসিয়া বসিয়া পাহারা দিতে বলিয়াছে, তাই দিতেছি। কোথায় কি আছে, কিছু জানি না।'

জলের ভিতর কি আছে, লোকটা তাহা আর বলিল না। কাঁদিতে লাগিল। তখনই লোক নামিল। কর্মভোগ টুটিয়া আসিয়াছে, সিন্ধুক পাওয়া গেল। মাছ-ধরা লোকটি আর সিন্দুক, সেইস্থানে রাখিয়া মামুদের বাড়ি গেলাম। মামুদ হাতি বটে। বিরাট দেহ। মহম্মদ খাঁ এই দেহের খাতিরে লোকের কাছে 'হাতি' উপাধি পাইয়াছে। দেখিলাম, হাতি আর তাড়িখানার সেই লোক দুটি বসিয়া আছে। তিন জনকেই বাঁধিলাম। মায় সিন্দুক চালান দিলাম। ঠিক দশ হাজার সাত শত টাকাই তাহাতে ছিল। বিপিনবাবু অব্যাহতি পাইলেন। মামুদ হাতি আর সঙ্গী দুটির দীর্ঘ কারাবাস হইল। মাছ-ধরা লোকট নির্দোষ; সে খালাস পাইল।

টীকা

১. **সিরাজগঞ্জ**: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ১১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে, ব্রহ্মপুত্র নদের খানিক পশ্চিমে, যমুনা নদীর তীরবর্তী জেলা শহর। পূর্বে পাবনা জেলার অংশ ছিল।

২. **সাংড়া**: দল। Convoy।

৩. **চড়ন্দার**: যানবাহনের সওয়ারি বা যাত্রী। মহিলা যাত্রীদলের সঙ্গী অভিভাবক-স্বরূপ পুরুষ যাত্রীকেও চড়ন্দার বলা হয়ে থাকে।

৪. **দামুকদেয়াড়**: দামুকদিয়া ঘাট পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১৮৭৮-এ কলকাতা থেকে দামুকদিয়া ঘাট পর্যন্ত ১৮৫ কিলোমিটার রেলপথে রেলগাড়ি চালাতে শুরু করে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। নদীর ওপারে সারা ঘাট। সেখান থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত

৩৩৬ কিলোমিটার পথে রেল চলাচল পরিচালনা করত নর্থ বেঙ্গল রেলওয়ে।

৫. এতেলা: সংবাদ বা খবর। প্রথম এতেলা—First Information।

৬. **আলেকম-আদব**: প্রধানত মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ 'আদাব'-এর অর্থ সালাম বা নমস্কার। আবার ইসলামি সম্ভাষণ 'আসসালাম আলাইকুম'-এর অর্থ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই সম্ভাষণের প্রতি-সম্ভাষণে বলা হয় 'ওয়ালেকুম সালাম'।

৭. **তেড়েল**: তাল বা খেজুরের রস গাঁজিয়ে প্রস্তুত মদকে বলা হয় তাড়ি। যারা তাড়ি সেবন করে, কথ্যভাষায় তাদের তেড়েল বলা হয়। যেমন, যারা গাঁজা সেবন করে, তারা হয় গেঁজেল।

৮. **বকরাটা**: বখরা বা ভাগাভাগি।

ISBN 978-93-80489-24-7